অপহরণ ১

মাসুদ রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা

অপহরণ-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশঃ মে, ১৯৮৭

এক

দু'পা হাঁটছে, থামছে–একে ঠিক পায়চারি বলে না। অস্থির, আড়ষ্ট একজন লোক। এখন বেশ ভালই ফুটেছে ভোরের আলো, গবাক্ষ, গরাদহীন জানালা, চওড়া কার্নিস, ঝুল-বারান্দা, মিনার আর গম্বুজ আকৃতির ছাদ, কামান বসাবার সার সার চৌকো গর্ত, ইত্যাদি নিয়ে আকাশ ছোঁয়া দুর্গটা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো তার পিছনে। নারেসবরো গ্রাম থেকে বাঁক নিয়ে ক্রমশ ওপর দিকে উঠতে শুরু করে দুর্গের সামনে পৌঁচেছে রাস্তাটা, সেদিকে বার বার তাকাল রিচার্ডসন।

ভাঙাচোরা নিষ্প্রাণ দুর্গ, এপ্রিলের ভেজা ভেজা ভোরের আকাশে হেলান দিয়ে মুখ ভেঙচে আছে। বলা চলে পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ। ভারী, গম্ভীর চেহারার ফটকগুলোয় কোন্ কালে এক একটা আধমণ ওজনের তালা ঝোলানো হয়েছিল, শুধু মরচেই ধরেনি, চাবি ঢোকাবার ফুটোগুলো ধুলো ঢুকে বুজে গেছে। দুর্গটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব সামান্যই, ব্রিটিশ পর্যটন পুস্তিকায় খুঁজলে পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে দু'একটা লাইন পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কাছ থেকে দেখলে নিঃসঙ্গ মনে হয় দুর্গটাকে, সময়ের সীমানা পেরিয়ে এসে বোবা পাথর বনে গেছে। এক সময় ভয়াবহ রক্তপাত ঘটেছে এখানে, পদাতিক সৈন্যরা ঝাঁক বেঁধে আসা-যাওয়া করেছে, খটাখট খটাখট ঘোড়ার খুরের

আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে দুর্গরক্ষীদের, কামানের মুহুর্মুহু গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠেছে গোটা এলাকা। একদিন সবই ছিল, আজ কিছুই নেই। কিন্তু রিচার্ডসনের তা মনে হলো না। অশুভ কিছু দেখতে পাচ্ছে, ঠিক তা নয়। ভূতুড়ে দুর্গের ছাদে কোন পেত্নীর কালো ছায়া হাঁটাচলা করছে না। বিদেহী কোন আত্মার করুণ বিলাপও শোনা যায়নি। এটা স্রেফ তার একটা অনুভূতি–যেন ভাঙা দেয়ালগুলোর কাছাকাছি এখুনি কিছু একটা নড়ে উঠতে পারে, হঠাৎ করে শোনা যেতে পারে আহত সৈনিকের আর্তনাদ। গোটা পরিবেশটা রোমাঞ্চকর আর রহস্যময় লাগল তার। মনে হলো, এখানে সে একা নয়। কালো জানালাগুলো থেকে উঁকি দিয়ে অশরীরী কারা যেন দেখছে তাকে।

বাস্তবে ফিরে এসে আবার রাস্তার বাঁকে তাকাল সে। গাড়ির আওয়াজ শোনার জন্য খাড়া করল কান। পাথরের ওপর দিয়ে পানি ছুটছে কলকল ছলছল–মৃদু, মধুর, কোমল একটা শব্দ। রাতের লণ্ডন থেকে একাকী গাড়ি চালিয়ে ভোর হবার খানিক আগেই এখানে পৌঁচেছে সে, নিশ্চয়ই এই পানির আওয়াজ শোনার জন্যে নয়। কোটের কলার খাড়া করল সে, ঠাণ্ডা বাতাস থেকে ঘাড়টা বাঁচল। তারপর পকেটে হাত ভরল গোলাপ কুঁড়ি বের করার জন্যে।

জোড়া গোলাপ কুঁড়ি হতে হবে, উইলিয়াম অবসন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে তাকে। অন্য কোন ফুলের কুঁড়ি হলে চলবে না। এটা একটা সঙ্কেত, দেখলেই যাতে চিনতে পারে রিচার্ডসনকে। যে সাবজেক্টকে নিয়ে এত কাঠ-খড় পোড়ানো তার কোড নেমও তাই–রোজ বাড, গোলাপ কুঁড়ি।

সেলোফেনের মোড়ক খুলে কুঁড়ি জোড়া বের করল রিচার্ডসন। অনেক নিচে, রাস্তার দিকে আরেকবার তাকাল। না গাড়ি, না গাড়ির শব্দ, কিছুই নেই। একটা কুঁড়ি থেকে পাপড়ি

ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটল সে। ভেতরে একটা অস্থিরতা বোধ করছে।

রিচার্ডসন যথেষ্ট লম্বা, কিন্তু এত লম্বা নয় যে আড়াই মণ ওজন মানিয়ে যাবে। বছরের পর বছর চেয়ারে বসে থেকে গায়ে চর্বি জমিয়ে ফেলেছে বেচারা। টকটকে লাল ফোলা মুখে চোখ দুটো চিকন একজোড়া ফাটল। বয়সের ভাঁজ পড়েছে চোখের চারপাশে, তবে সরু ফাটল জোড়ার ভেতর থেকে ঝিলিক দেয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কালো বোলার হ্যাট পরেছে সে, স্যুটটাও কালো, এ-ধরনের দেখাসাক্ষাতের জন্যে এটাই বোধহয় ঠিক রঙ। কোটের ভেতর তার কাঁধ দুটো সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে, এত বছর ধরে এত সব গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেয়ার ফলশ্রুতি। চর্বিবহুল হলেও, তার ম্লান আঙুলগুলো লম্বা আর সরু। এই আঙুলে ধরা লাল গোলাপ কুঁড়ি বেমানান নয়।

মুখের সামনে একটা হাত এনে হাই তুলল সে। সব কাজ শেষ হলেও, রিপোর্টটা টাইপ করা বাকি ছিল। সন্ধে থেকে শুরু করে রাত আড়াইটা পর্যন্ত টাইপ করতে হয়েছে। সাথে সাথে রওনা হতে পারেনি, তার আগে সমস্ত প্রমাণ, চিহ্ন ইত্যাদি নষ্ট করতে হয়েছে। এক কাপ চা খাওয়ার বা পাঁচ-সাত মিনিটের জন্যে চোখ বোজার সুযোগ মেলেনি। ক্লান্ত বটে, কিন্তু বিষণ্ন নয়। বগলের নিচে কালো লেদার ব্যাগে নিরাপদে রয়েছে রিপোর্টটা, খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে গর্ব অনুভব করছে রিচার্ডসন। কর্নেল উইলিয়াম অবসন সময়টা ভালই বেছেছেন, দিনের আরম্ভ। রিচার্ডসনের বিশ্বাস তার জীবনে আজকের দিনটা নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে।

দুর্গের ভাঙাচোরা পাঁচিলের মাঝখানে পাথুরে গেটটা এখনও কোন রকমে খাড়া হয়ে আছে। খোলা গেট দিয়ে রাস্তার অপর দিকটা দেখা যায়। এদিকে লোকবসতি নেই বললেই চলে,

কাফেটা খুললেও বেলা আটটার আগে সম্ভাবনা কম। রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি, ঝাঁকড়া মাথাগুলো ঘন সবুজ। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে আসা রাস্তাটায় সর্বশেষ পিচ ঢালার পর কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে, খানা-খন্দে ভরা। পুব আকাশ রাঙা হয়ে উঠছে দেখে আবার বাঁকের দিকে তাকাল রিচার্ডসন। গাছের পাতা ছাড়া কোথাও কিছু নড়ছে না। গোটা এলাকা নির্জন আর নিস্তব্ধ। কর্নেল আসছে না কেন?

কর্নেল উইলিয়াম অবসনের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই রিচার্ডসনের। কিন্তু লোকটা যে সি.আই.এ-র দ্বিতীয় ব্যক্তি, এটুকু তার ভাল করেই জানা আছে। এর আগে সম্ভবত প্রকাশ্যে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের পরিচয় ফাঁস করার ঝুঁকি নেয়নি সে। কর্মকর্তারা এই সুযোগটা ভোগ করে—নেপথ্যে থাকে তারা, বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে। কর্নেলের মত রিচার্ডসনের চাকরিটাও নিরাপদ। ডেস্কে, প্রতিপক্ষের চোখের আড়ালে বসে কাজ করে সে। তবে কর্মকর্তারা রিভলভিং চেয়ারে বসে হুকুম দিয়েই খালাস, কাজের আসল ধকল সামলাতে হয় তার মত লোকদের। ডাটা সংগ্রহ করা, উপযুক্ত লোককে অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া, রিপোর্ট লেখা, সম্ভাবনার নতুন দিক আবিষ্কারের জন্যে গবেষণা করা, সবই তাদের করতে হয়। কর্তারা পলিসি নির্ধারণ করে, পলিসি বাস্তবায়িত করে তারা। অতি মূল্যবান খুঁটিনাটি তথ্য কর্তাদের গোচরে আনার দায়িত্বও তাদেরই ওপর।

বগলের নিচে লেদার ব্যাগটা আরও জোরে চেপে ধরল রিচার্ডসন। একটা অসম্ভব অ্যাসাইনমেন্টের বিশদ রূপরেখা রয়েছে এই রিপোর্টে। অসম্ভব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই এই রূপরেখা কাজে লাগতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা কাজটা করার দায়িত্ব এত থাকতে শুধু তাকেই দেয়া হয়েছে। এই পেশায় এটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কর্তারা

তার কাজে দীর্ঘদিন ধরে সন্তুষ্ট, সেটাই প্রমাণিত হয়। এবার অনেক দিনের প্রাপ্য সম্মান জুটবে কপালে। না, সে কোন প্রচার পাবে না, জানে রিচার্ডসন। প্রশ্নই ওঠে না। কারণ গোটা ব্যাপারটা এক্কেবারে টপ সিক্রেট। সহকারী সহকর্মীরাও ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানতে পারবে না। তবে সবাই তার পদোন্নতি দেখতে পাবে, দেখতে পাবে ঘন ঘন কর্তাদের দফতরে ডাক পড়ছে তার। নতুন মর্যাদা পাবে সে, সবাই তাকে অন্য চোখে দেখবে। এতবছর ধরে যারা তাকে এড়িয়ে গেছে, অবহেলা করেছে, দেখেও না দেখার ভান করেছে, এরপর থেকে তারাই তার পরামর্শ পাবার জন্যে ভিড় জমাবে। খুশি হবে খাতির করার সুযোগ পেলে।

কর্নেলেরও যে কৃতিত্ব নেই, তা নয়, ভাবল রিচার্ডসন। এত লোকের ভেতর থেকে তাকে খুঁজে বের করেছে কর্নেল, এ-ও কম কথা নয়। নিজের প্রশংসা করা পছন্দ নয় তার, কিন্তু কর্নেল যে সেরা রিসার্চ অ্যানালিস্ট-কে খুঁজে বের করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই কাজের জন্যে তারচেয়ে উপযুক্ত লোক আর কই! তাছাড়া, শুধু উপযুক্ত হলেই তো হয় না, বিশ্বস্ততাও থাকতে হয়। কেউ বলতে পারবে তার রেকর্ডে কোন লাল কালির আঁচড় আছে?

হঠাৎ থেমে পায়ের কাছে মাটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল রিচার্ডসন। এটা কিভাবে সম্ভব হলো? হাতের গোলাপ কুঁড়ির দিকে তাকাল সে। এটা কি অশুভ কোন লক্ষণ? ঝুঁকল সে, মাটি থেকে তুলে নিল অক্ষত, প্রায় তাজা একটা পাপড়ি। কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে কে জানে তার হাত লেগে কুঁড়ি থেকে খসে পড়েছিল। আগের পাপড়িটা থো থো করে মুখ থেকে ফেলে দিল সে, দ্বিতীয়টা দাঁতের মাঝখানে আটকাল। নিজের চারপাশে মাটিতে ভাল করে তাকাল, না, আর পড়েনি। সিধে হতে যাবে,

চোখের কোণে কি যেন নড়তে দেখে স্থির হয়ে গেল সে।

ডান দিকে।

দুর্গের নিচের ঢাল থেকে আসছে লোকটা। গোটা দুর্গটাকেই ঘিরে আছে ঢাল, পায়ে হাঁটা সরু পথ ধরে প্রশস্ত লনে উঠে আসছে সে। কোন তাড়া নেই, ধীর পায়ে, অলস ভঙ্গিতে। এতটা দূর থেকেও মনে মনে প্রভাবিত হলো রিচার্ডসন। আগন্তুককে মোটেও সি.আই.এ-র হোমরাচোমরা কেউ বলে মনে হলো না। পরনে দামী কোন স্যুট নয়, জুতো জোড়া ইটালিয়ান চামড়া দিয়েও তৈরি নয়। রঙ চটা জিনসের ট্রাউজার পরে আছে, পায়ে সাধারণ একজোড়া ম্লান রঙের জুতো, মাথায় নীল নাবিকের ক্যাপ, ভুরু পর্যন্ত নেমে এসেছে। এরচেয়ে নিখুঁত ছদ্মবেশ আর কি হতে পারে? একজন নাবিক, প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। আশ্চর্য, রিচার্ডসন ধারণাও করেনি, এত থাকতে ওদিক থেকে আসবে কর্নেল।

গোলাপ কুঁড়ির বোঁটা দুটো দু'আঙুলের মাঝখানে আটকে নিয়ে এগোল রিচার্ডসন। পায়ে হাঁটা দুর্গের যেখানে সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁচেছে, সেখানে থামল। আগন্তুক দশ হাতের ভেতর চলে এল। সবিনয় হাসির সাথে মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, 'প্রাতঃভ্রমণ স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল।'

'ভাগ্যিস সবাই সেটা বোঝে না!' জবাব দিল কর্নেল।

সরু পথটা ধরে দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। দুর্গটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা, ঢাল বেয়ে নামল নিচের লনে। লনের কিনারা থেকে ঝপ্ করে নেমে গেছে মাটি, নিচে নদী। লনে এক মুহূর্ত দাঁড়াল কর্নেল, নদীর ওপারে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। গ্রাম বলতে দু'চারটে কুঁড়ে ঘর, নদীর দিকে পিছন ফিরে আছে, লোকজন দেখা যায় না।

'বলুন,' মৃদু কণ্ঠে, কিন্তু কর্তৃত্বের সুরে অবশেষে জানতে

চাইল কর্নেল।

কর্নেলের বয়স তার চেয়ে কম, লক্ষ করে অস্বস্তিবোধ বেড়ে গেল রিচার্ডসনের। পঁয়তাল্লিশ, বড়জোর পঞ্চাশ। সরু মুখে উদ্বেগের ছিটেফোঁটাও নেই, চেহারায় নগ্নভাবে ফুটে আছে অনভিজ্ঞতার ছাপ। 'সমস্যাটা নিয়ে দিনের পর দিন মাথা ঘামিয়েছি...,' শুরু করল রিচার্ডসন।

কিন্তু কর্নেল অবসন তাকে থামিয়ে দিল। 'টেকনিক সম্পর্কে নয়, আমি ফলাফল জানতে চাই। কাজটা সম্ভব?'

'জ্বী, স্যার,' তাড়াতাড়ি বলল রিচার্ডসন। 'জ্বী, কাজটা করা সম্ভব।'

নদীর দিকে পিছন ফিরল কর্নেল, ধীর পায়ে দ্বিতীয় ঢালের দিকে এগোল, যেদিক থেকে এসেছে সে। সসম্ভ্রমে খানিকটা পিছনে থেকে তাকে অনুসরণ করল রিচার্ডসন। ঢাল পেরিয়ে এল ওরা। প্রায় খাড়া পাড় বেয়ে নদীর দিকে নামতে শুরু করল। 'কিভাবে?' জানতে চাইল কর্নেল।

ঠিক সময়টাতে কোত্থেকে শুরু করবে ভেবে ইতস্তত করতে লাগল রিচার্ডসন। কর্নেল সংক্ষেপে শুনতে চাইবেন, বাহুল্যবর্জিত এবং বোধগম্য হওয়া চাই। তার জানা আছে, সতর্কতার সাথে মুখ খুলতে হবে তাকে, শব্দ নির্বাচনে ভুল করা চলবে না। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে কর্নেলের পাশে চলে এল সে। 'হোয়াইট হাউস থেকে এটা চুরি দিয়ে শুরু করব আমরা।' কর্নেলের হাতে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ গুঁজে দিল সে, সংবাদপত্রের কাটিং।

মুহূর্তের জন্যে কর্নেল অবসনের নির্লিপ্ত চেহারা উল্লাসিত হয়ে উঠল। আইডিয়াটা তার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তারপরই ভুরু কোঁচকাল সে।

সন্দেহগুলো কর্নেল মুখ ফুটে প্রকাশ করার আগেই রিচার্ডসন

তাড়াহুড়ো করে বলল, ‘সম্ভাব্য সবচেয়ে যোগ্য লোককে দিয়ে কাজটা করাব আমরা। সেরা প্রফেশন্যালদের একজন হতে হবে তাকে। এমন একজন, যে পিছনে কোন প্রমাণ বা সূত্র রেখে আসে না, সব মুছে পরিষ্কার…’

‘হ্যাঁ, বুঝলাম,’ ঝাঁঝের সাথে বলল কর্নেল। ‘এ-সব আমি জানি।’ কাগজের ভাঁজ খুলে ফটোটা আবার একবার দেখল সে। ‘কিন্তু তারপর কি হবে? হোয়াইট হাউস থেকে ওটা চুরি করা হলো, তারপর কি ঘটবে? কিভাবে ঘটবে?’ গোটা প্ল্যানটা শুনতে চাইছে সে।

‘চুরি করার পর, উদ্ধারের জন্যে আমরাই সূত্র যোগান দেব, স্যার,’ বলল রিচার্ডসন। গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে শব্দগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করল সে। তার হাবভাবে দক্ষ সিভিল সার্ভেন্টের পরিচয় প্রকট হয়ে উঠল। হাত দুটো পিছনে, ধীর পায়ে হাঁটছে, বগলের নিচে লেদার ব্যাগ। ‘দুনিয়ার যে সব জায়গায় গোলমেলে হয়ে উঠেছে পরিবেশ, বিশেষ করে যে-সব জায়গায় আমেরিকার মর্যাদা এখনই যায়-যায় অবস্থা, সূত্রগুলো সে-সব জায়গায় ছাড়া হবে। প্রয়োজনে গোপন তৎপরতা চালিয়ে পরিবেশ আরও গরম করে তোলা যাবে। প্ল্যানটা যদি সতর্কতার সাথে করি, ছোট বড় মিলিয়ে গোটা কয়েক বিষাক্ত কাঁটাও তোলা সম্ভব হবে—এগুলো উপরি পাওনা। সূত্রগুলো এমন হবে, চুরি যাওয়া আইটেম উদ্ধারে কোন সাহায্যে আসবে না। যাতে উদ্ধার করতে না পারে তার জন্যে কাজ করব আমরা।’

‘হুঁ। ভাল। কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি,’ বলল কর্নেল। তার চেহারা আবার উল্লাসিত হয়ে উঠল। ‘তারপর, সবশেষে, সাবজেক্টকে জায়গা মত পৌঁছে দিয়ে পুরস্কার জিতে নেব।’

‘জ্বী, স্যার। কিন্তু যার প্রাপ্য তার ঘাড়ে সমস্ত দায় না চাপিয়ে নয়।’

কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না কর্নেল। পাড় বেয়ে নামল সে। তীর ঘেঁষে এগোল। অন্যমনস্ক। তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'খুবই ভাল। কাজটা আপনাকে দিয়ে সত্যি ভুল করিনি দেখছি। আমি সন্তুষ্ট।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজে প্রশংসাটুকু উপভোগ করল রিচার্ডসন।

'কিন্তু এসবই জল্পনাকল্পনা মাত্র। এবার বলুন, যে সাবজেক্টের কথা ভাবছেন, তাকে কি চুরি করা সম্ভব?'

'জ্বী স্যার, এটাই আসল প্রশ্ন,' বলল রিচার্ডসন। 'আমার ধারণা, সম্ভব। আসলে, স্যার, আপনি জানেন, কোন কাজই অসম্ভব নয়।'

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে রিচার্ডসনের দিকে ফিরল কর্নেল অবসন, কটমট করে তাকাল। 'আমি আপনাকে সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাতে বলিনি। আমি বলেছিলাম ফ্যাক্টস যোগাড় করে...'

একটুও ঘাবড়াল না রিচার্ডসন। মনে মনে নিজেকে শক্ত করল সে, তিক্ত হলেও সত্যি কথাটা বলতে হবে তাকে। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'জ্বী না, এই কাজের উপযুক্ত লোক আমি পাইনি। নেই।'

'হোয়াট!' চাপা স্বরে গর্জে উঠল কর্নেল। 'নেই?'

শান্তভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল রিচার্ডসন।

'সি.আই.এ. এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান, দুনিয়ার যে-কোন প্রান্তে যে-কোন মুহূর্তে আমরা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারি, কোটি কোটি ডলার খরচ করে হাজার হাজার এজেন্ট পোষা হচ্ছে, আর আপনি বলছেন এই কাজের উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে না?'

'সি.আই.এ.-তে যোগ্য লোকের অভাব আছে তা আমি বলিনি, স্যার। কাজটা করতে পারবে এমন লোক বেশ

কয়েকজনই আছে। কিন্তু তাদেরকে বিশ্বাস করে কাজটা আমরা দিতে পারি না। এই জন্যে যে, কাজটা কি জানার পর ওদের বেশিরভাগেরই হয় মাথা খারাপ হয়ে যাবে, নয়তো ভয়ে গা ঢাকা দেবে—যদি খবরের কাগজে বেনামা-চিঠি পাঠিয়ে সব ফাঁস করে দেয় তাতেও আমি আশ্চর্য হব না। উপযুক্ত লোক নেই অর্থে আমি বলতে চেয়েছি সব দিক থেকে যোগ্য লোক নেই। কেউ কেউ খুবই ভাল, কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বস্ত নয়। কারও মধ্যে রয়েছে আনুগত্যের অভাব। কেউ আবার অতি চালাক, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাইবে। এই কাজের গুরুদায়িত্ব মাথায় নেয়া চাট্টিখানি কথা নয়…'

'তাহলে?'

রিচার্ডসন চুপ করে থাকল।

রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেল কর্নেল। 'আপনি অসম্পূর্ণ একটা রিপোর্ট তৈরি করে এনেছেন?' হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল তার। 'আপনাকে আমি বলেছিলাম…'

সময় বুঝে মুখ খুলল রিচার্ডসন, 'সব দিক থেকে উপযুক্ত লোক একজনই আছে, স্যার। কিন্তু…'

'কে সে?' মারমুখো হয়ে জানতে চাইল কর্নেল।

'সি.আই.এ-র কেউ নয়,' বলল রিচার্ডসন। 'এমন কি আমেরিকানও নয়। আপনি তাকে চেনেন।'

আবার গর্জে উঠতে গিয়ে থমকে গেল কর্নেল। স্মরণ করার চেষ্টা করল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিচার্ডসনের মুখের প্রতিটি ভাঁজ লক্ষ করছে। 'নাম কি?'

'মাসুদ রানা।'

তাই তো—হ্যাঁ, অবশ্যই। মাসুদ রানা। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা বোধ করল কর্নেল, প্রায় পুলকের মত একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। চিন্তিতভাবে নদীর দিকে তাকাল সে,

চট করে একবার রিচার্ডসনের নির্লিপ্ত চেহারাটা দেখে নিল। ব্যাটাচ্ছেলে গণক নাকি? মাসুদ রানার কথা তার পেটে ছিল, কিন্তু বেরুল ওর মুখ দিয়ে। কর্নেলের মনে পড়ল, কাজটা কি তা না বললেও, তার সাহায্য দরকার হবে এ-কথা কিছুদিন আগে রানাকে জানিয়েছে সে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল কর্নেল। গোটা দুনিয়ার এসপিওনাজ জগতের ছবি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। যখনই দেখা যায় কোন কাজের জন্যে মাত্র একজন উপযুক্ত লোক আছে, সেই লোকটা কেন সব সময় মাসুদ রানা হতে বাধ্য? এর কারণ অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করে। কেউ বলে রানা সুপারম্যান, কেউ বলে রানা অজেয়, আবার অনেকে না জেনেই বলে রানা কখনও ব্যর্থ হয় না। এ-সব কোনটাই বিশ্বাস করে না কর্নেল। শুধু সাফল্যের খবর নয়, রানার ব্যর্থতার খবরও জানা আছে তার। তবু মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে এসপিওনাজ জগতে মাসুদ রানা সত্যিই একজন নির্ভরযোগ্য এজেন্ট। কর্নেলের বিশ্বাস, শুধু একটিমাত্র অতিরিক্ত গুণ থাকায় আর সব এজেন্টদের চেয়ে অনেক আলাদা রয়েছে রানা। একশো এজেন্টকে যদি ডেকে বলা হয়, নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল পেরিয়ে সূর্য থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আনতে হবে, হেসেই খুন হবে নিরানব্বুই জন। শুধু একজন, হাসির আওয়াজ থামার অপেক্ষায় বসে থাকবে, তারপর জিজ্ঞেস করবে, এ-ব্যাপারে সম্ভাব্য কি কি সাহায্য করা হবে তাকে। অর্থাৎ এই একজন কোন কাজকেই অসম্ভব বলে মনে করে না। কাজটা যত কঠিনই হোক, সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখতে চায়। এবং, আশ্চর্য, সম্ভাবনা যেখানে শূন্য, সেখানেও হাল ছেড়ে দেয় না—জানে চেষ্টা করাটাই পাগলামি, তবু চেষ্টা করে দেখতে চায়। এ সেই, মাসুদ রানা—শয়ে বা হাজারে নয়, লক্ষ-কোটিতে একজন।

রানা সম্পর্কে প্রায় সবই জানা আছে কর্নেলের। তবু রিচার্ডসনের ধারণা কি জানতে পারলে ভাল হয়। 'হ্যাঁ, রানাকে আমি চিনি। কিন্তু এই কাজের জন্যে আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারি না। এত থাকতে শুধু রানাকেই আপনি উপযুক্ত ভাবলেন, কারণটা কি?'

কেশে গলা পরিষ্কার করল রিচার্ডসন। 'ওর কোন ভয় নেই,' এক কথায় জবাব দিল সে।

'মানে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, স্যার, আপনার এই কাজ কেউ নিতে চাইবে না–ভয়ে। কিন্তু মাসুদ রানার মধ্যে ওই জিনিসটা প্রায় নেই বলেই আমি জানি।'

'আপনি বলছেন কাজটা রানা করে দেবে?'

মাথা নাড়ল রিচার্ডসন। 'করতে পারবে, এটুকু জানি। করে দেবে কিনা সেটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রসঙ্গ। আপনি ব্যক্তিগতভাবে তাকে অনুরোধ করে দেখতে পারেন। তবে ওকে রাজি করাবার আগে ওর বসকে যদি রাজি করাতে পারেন, সবচেয়ে ভাল হয়।'

'ব্যস? ভয় নেই এটাই ওর একমাত্র যোগ্যতা?'

মাথা নাড়ল রিচার্ডসন। 'সেরা এজেন্টদের যে-সব গুণ থাকা দরকার তার সবগুলোই আছে রানার মধ্যে।' এরপর তিন মিনিট রানার গুণের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিল সে। সবশেষে বলল, 'ওর একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম আছে, কাজেই আমরা ওর মক্কেল হতে পারি। অবশ্য অসম্ভব ফি চাইবে ও।'

'টাকা কোন সমস্যা নয়,' বিড়বিড় করে বলল কর্নেল।

'তাহলে রানাই আমাদের উদ্ধার-কর্তা,' বলল রিচার্ডসন।

'ও আমেরিকান নয়, তাতে কি সুবিধে হবে?'

'অবশ্যই। যদি নেয়, কাজটাকে স্রেফ একটা কেস হিসেবে নেবে ও,' বলল রিচার্ডসন। 'ইমোশন্যালি ইনভলভড হবে না।'

‘ভয় নেই, যখন যা খুশি সাজতে পারে, গায়েব হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জুড়ি নেই, অনেকগুলো ভাষা জানে, বুদ্ধিমান–আপনার ভাষায় এই হলো রানা। ও কি···?’

‘দুঃখিত, স্যার,’ তাড়াতাড়ি বলল রিচার্ডসন, ‘ওর আরও একটা গুণ আছে।’

‘ইয়েস?’

‘চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে ভালবাসে রানা, বলতে পারেন এটা তার একটা নেশার মত।’

‘সন্দেহ নেই, আপনি লোকটার ওপর প্রচুর রিসার্চ করেছেন।’

‘জ্বী, স্যার।’

‘তাহলে বলুন, রানাকে নিয়ে অসুবিধে কি?’

গম্ভীর হলো রিচার্ডসন। ‘নীতির প্রশ্নে আপোষ করতে জানে না লোকটা। বড় বেশি স্বাধীনচেতা। যদি টের পায় তাকে দিয়ে কোন অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়া হয়েছে, প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না।’

‘আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন,’ বলল কর্নেল। রানা এমন একটা চরিত্র, যার সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। অথচ এই কাজের জন্যে সে-ই একমাত্র উপযুক্ত লোক। ‘কাজটা যাকে দিয়েই করাই, তাকে সব কথা বলা সম্ভব নয়। অন্ধকারে থেকে কাজ করতে রানা কি রাজি হবে?’

‘না।’

‘সব কথা বলতে হবে ওকে?’

‘সব কথা, স্যার।’

ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ল কর্নেল উইলিয়াম অবসন। সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে। সে-ও জানে, রানা পারবে। কিন্তু ও যদি নিষিদ্ধ এলাকায় নাক গলাতে চেষ্টা করে? ভাবল, চিন্তা কি, তারও তো ওষুধ আছে। ‘জানেন সে এখন কোথায়?’

'জ্বী, স্যার। ব্রাসেলসে।' রিচার্ডসনের হৃদস্পন্দন একটু দ্রুত হলো। কালো লেদার ব্যাগটা খুলল সে। 'এই নিন, স্যার,' বলল সে। 'রানার সম্পূর্ণ ডোশিয়ে।'

অবসন কিছু বলল না। রিচার্ডসনের হাতে ধরা ডকুমেন্টের দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। ব্যাপারটা রিচার্ডসন লক্ষ করল না।

'আপনার জন্য আরও একটা জিনিস নিয়ে এসেছি, স্যার,' বলল সে, আবার ব্যাগের ভেতর হাত ভরে দিল। 'যে প্ল্যানটা নিয়ে আলোচনা করছি, তার বিশদ রূপরেখা তৈরি করেছি আমি। সম্ভাব্য কয়েকটা জায়গার নাম দেয়া আছে, যে-সব জায়গায় সূত্র রেখে আসতে পারব আমরা। ক্লাইমেক্সের ধরন আর দোষ চাপাবার কায়দা কি রকম হবে তাও আমি ব্যাখ্যা করেছি।' খানিক ইতস্তত করল রিচার্ডসন, তারপর আবার বলল, 'আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলেননি। শূন্য স্থানগুলো নিজেকেই আমার পূরণ করে নিতে হয়েছে—বলতে পারেন, অভিজ্ঞতার আলোকে আন্দাজ করে নিয়েছি। তবে আপনি যদি পড়েন এটা, আমার ধারণা, স্যার, প্রচুর মালমশলা দেখতে পাবেন।'

এবার আর হতাশা গোপন রাখার চেষ্টা করল না কর্নেল। স্তম্ভিত চেহারায় নগ্ন ক্রোধ ফুটে উঠল। 'আহাম্মকের মত সব আপনি কাগজে লিখে ফেলেছেন!'

গালি খেয়েও হাসল রিচার্ডসন। 'কোন ভয় নেই, স্যার। রাতের বেলা কাজ করেছি আমি, কোথাও কেউ ছিল না। সমস্ত কাগজ ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেছি—সমস্ত। থাকার মধ্যে আছে শুধু এই কাগজ কটা।'

রিচার্ডসনের হাতের কাগজগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কর্নেল। দ্রুত চিন্তা করছে সে। ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলা কাগজে কি লেখা ছিল কেউ তা জানতে পারবে না। কিন্তু টাইপরাইটারের

ক্যারিজে অক্ষরের ছাপ রয়ে গেছে। অবশ্য বুড়োর অফিস আর শোবার ঘরে ভাল করে তল্লাশি চালাবার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। না, অফিসে বা বাড়িতে দু'একটা প্রমাণ যদি থেকেও থাকে, সেগুলো মুছে ফেলা কোন সমস্যা নয়। কাগজগুলোর দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করল সে, 'আর কোন কফি?'

'মাত্র দুটো। একটা আপনার জন্যে, আরেকটা আমার জন্যে। দুটোই রয়েছে এখানে।'

স্বস্তির হাসি ফুটল কর্নেলের চেহারায়। 'চমৎকার, রিচার্ডসন। আমি খুশি। দিন দেখি কি করেছেন আপনি।'

রিপোর্টটা নিয়ে পড়তে শুরু করল কর্নেল। নদীর তীর ঘেঁষে এগোল ওরা, তারপর একটা কাঠের বেঞ্চে বসল। কর্নেলের পাশেই বসল রিচার্ডসন। মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে, দুর্গের দিকে তাকাল সে। না, দেখা যায় না। দুর্গটা নদীর উঁচু পাড়ে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে। নদীর বাঁকের কাছে রাস্তার ওপর কাফেটা দেখা যায়, কিন্তু অনেক দূরে। নদীর ওপারে ঘরগুলো ঢাকা পড়েছে গাছপালার আড়ালে। গরমের দিন, আকাশে মেঘ নেই, সদ্য ওঠা সূর্য এখনও তেতে ওঠেনি। পকেটে হাত ভরল রিচার্ডসন, তারপর ইতস্তত করতে লাগল। কর্তাব্যক্তির সামনে কি সিগারেট খাওয়া উচিত হবে?

সিগারেট নয়, গোলাপ কুঁড়ি জোড়া বের করল সে। দাঁত দিয়ে একটা পাপড়ি কাটল।

আড়চোখে ব্যাপারটা লক্ষ করল কর্নেল অবসন, কিন্তু মনোযোগ পড়ার দিকে। শেষ পাতাটা পড়া হতে মুখ তুলল সে, কিন্তু রিচার্ডসনের দিকে নয়।

নদী ছুটে চলেছে। স্রোত তেমন বেশি নয়, কিন্তু ঢেউ আছে। তীরের কাছাকাছি পানি থেকে উঁকি দিচ্ছে অসংখ্য পাথর। ঢেউগুলো তেড়ে এসে সেগুলোর ওপর সশব্দে ভাঙছে। সাদা

ফেনায় ফুলে আছে পানির গা। নদীর দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু রিচার্ডসন আর নিজের প্ল্যানের কথা ভাবছে সে।

রিচার্ডসনকে বেছে নিয়ে ভুল করেনি সে। লোকটা বিশ্বস্ত এবং কঠোর পরিশ্রমী। সবচেয়ে বড় কথা, সন্দেহ প্রবণ নয়। সব অর্থেই, নির্ভেজাল কেরানী–যা করতে বলা হয় তা করতে পারে, কিন্তু কল্পনাশক্তি খাটাতে উৎসাহী নয়। থাকলে তো! এই ব্যাপারটার সাথে তার সম্পর্ক আছে, এরকম ভাবার কোন কারণ নেই কারও। কিন্তু কর্নেল তাকে খুব ছোট করে দেখেছিল, সেজন্যেই অনেক বেশি তথ্য যোগান দিয়েছিল সে। ব্যাপারটা হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে, কারণ সবটুকু না হলেও গোটা ব্যাপারটার অনেকটাই আন্দাজ করে নিয়েছে রিচার্ডসন–ঘটনা ঘটতে শুরু করলে বাকিটুকু, মূল রহস্য, জেনে ফেলবে সে। অথচ এই প্ল্যানের কথা বড়জোর দু'জন জানতে পারে, তিনজনের জানা চলে না।

তবে, হ্যাঁ–প্ল্যানটা চমৎকার।

কর্নেল রিচার্ডসনের দিকে তাকাল। 'এর মধ্যে সবই আছে।'

'বললাম না!'

'আপনি ঠিক জানেন, আর কোন কপি নেই? ভুল করে কিছু ফেলে রাখেননি ডেস্কে? কিংবা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে কিছু রয়ে যায়নি?'

'স্যার, আমাকে দেখে কি মনে হয় আপনার–গর্দভ? বত্রিশ বছর কাজ করছি, কোন্ কাজের কি গুরুত্ব আমি বুঝি না?'

'তা ঠিক,' বলল কর্নেল। পকেট থেকে একটা ঝর্ণা কলম বের করল সে। অলসভঙ্গিতে ক্যাপ খুলল। রিচার্ডসনের দিকে তাক করল সেটা। সূর্যের কিনারা থেকে গোত্তা দিয়ে নেমে এল একটা সোনালি ডানার চিল, নদীর কাছাকাছি নেমে এসে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। মনে হলো গাছগুলোর মগডালে বসবে।

কিন্তু না, গাছের মাথা ছাড়িয়ে উড়ে গেল সেটা, হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে। এই সোনালি ডানার চিলটাকেই শেষ দেখা দেখল রিচার্ডসন। তীক্ষ্ণ, সংক্ষিপ্ত একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, নদীর ছলছল কলকল আওয়াজে চাপা পড়ে গেল সেটা। ঝাঁকি খেয়ে হাত দুটো উঠে এল মুখে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দ্রুত হাতে লাশের পকেটগুলো সার্চ করল কর্নেল। নদীর পাশে ঝোপ গজিয়েছে, তার আড়ালে টেনে নিয়ে গেল লাশটা। আজ কোন এক সময় কেউ যখন লাশটা দেখতে পাবে, বিষের সমস্ত চিহ্ন গায়েব হয়ে যাবে ততক্ষণে। সবাই জানবে, ছুটি কাটাতে এসে সরকারি কেরানী ভদ্রলোক হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।

রিচার্ডসনের রিপোর্টটা কালো লেদার ব্যাগে ভরে নিল কর্নেল উইলিয়াম অবসন। তারপর ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে নদীর কিনারা ঘেঁষে খানিকদূর হেঁটে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। পিছনে পড়ে থাকল সেলোফেনের খোলা মোড়কটা, আর একজোড়া গোলাপ কুঁড়ি।

দুই

গ্রান্দ বেতান, এথেন্সের সেরা হোটেল। সাধারণত সম্রাট আর ধনকুবেররাই পায়ের ধুলো দেন এখানে। যুদ্ধের শেষ দিকে এই হোটেলেরই করিডরে আততায়ীর হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে যান উইনস্টন চার্চিল।

গ্রান্দ বেতানের একটা বার, রঁদেভো। ঝলমলে পর্দা, পালিশ করা কাঠ, আর চামড়া দিয়ে তৈরি চেয়ার, মাথার ওপর ঝুলছে ঝাড়বাতি। এক কোণে লম্বা মেহগনি কাঠের বার, ধনুক আকৃতির। এই বারের সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী, কূটনীতিক, আর গুপ্তচরদের সাথে নিচু গলায় কথা বলে বারটেণ্ডার–ট্যুর বুকে লেখা কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। এপ্রিলের সন্ধ্যা ছ'টায় ধীরে ধীরে ভরে উঠছে ঘরটা। পুরুষদের প্রায় সবার পরনেই বিজনেস স্যুট, বেশিরভাগই ট্যুরিস্ট, জানে গ্রীসে বেড়াবার জন্যে গরমকালটাই একমাত্র সময়। লাবণ্যময়ী ললনারাও আছে, পরনে উজ্জ্বল পোশাক, চারদিকে ছড়িয়ে থাকা টেবিলে থোকা থোকা ফুলের মত সাজানো। যন্ত্র-সংগীত বাজছে না, শুধু কথা বলার মৃদু গুঞ্জনের মাঝখানে থেকে থেকে শোনা যায় নারীকণ্ঠের মধুর হাসি, আর গ্লাসের ভেতর টুকরো বরফের টুংটাং নড়াচড়া। সুকুমার বারটেণ্ডার সাদা পোশাক পরে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাতে রূপালি ট্রে নিয়ে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যাচ্ছে সে।

লবি থেকে রঁদেভোয় ঢুকল মাসুদ রানা। ঝাড়বাতি থেকে গোলাপী আভা বেরুচ্ছে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চারপাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল ও। যারা দূরে তাদের অনেককেই পরিষ্কার দেখা গেল না, তবে পরিবেশটা দেহ-মনে প্রশান্তির একটা সুবাতাস বইয়ে দিল। এ যেন অনেকটা যার বাড়ি নেই তার বাড়িতে ফিরে আসা। ওয়েটারের সাহায্যে কোণের একটা টেবিল নিল ও, এখান থেকে ঘরটার সবখানে দৃষ্টি চলে। চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওয়েটারের দিকে ফিরে অর্ডার দিল, 'নির্জলা হুইস্কি।'

কোন সন্দেহ নেই ভদ্রলোক আপাদমস্তক আমেরিকান, মনে মনে ভাবল ওয়েটার। বয়স আটাশ কি ঊনত্রিশ, ছ'ফিটের কাছাকাছি লম্বা, খেলোয়াড়সুলভ একহারা গড়ন, রোদে পোড়া

তামাটে রঙ, লম্বা ফ্যাশনের চুল। নিশ্চয়ই কোন প্লেবয় হবে!

মাসুদ রানা ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। আজ আমেরিকান সেজেছে, কাজেই পাসপোর্ট পরিচয়-পত্র ইত্যাদির সাথে আচরণ, হাবভাব সবকিছুই একজন আমেরিকানের মত হয়ে উঠেছে। কাল আবার সাজতে পারে ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, বা রাশিয়ান, তারই সাথে ভাষাসহ আবার বদলে যাবে সবকিছু। নতুন একটা নামের সাথে ও সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষ হয়ে ওঠে–কখনও এক ঘণ্টা, এক দিন, বা এক মাসের জন্যে। নামটা বদলে যাবার সাথে সাথে মানুষটাও বদলে যায়, বেরিয়ে আসে আরেক পরিচয়ে আরেক মানুষ। দুই ছদ্মবেশের মাঝখানে মানুষটা আবার মাসুদ রানা হয়ে ওঠে–নিখাদ বাংলাদেশী বাঙালী। রূপ আর পরিচয় বদলের এই অসাধারণ কৌশল আয়ত্তে আছে বলেই কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক না করে যে-কোন আন্তর্জাতিক সীমান্ত অনায়াসে পেরোতে পারে রানা।

ট্রে হাতে ফিরে এল ওয়েটার। মুখ তুলে তাকাল রানা। লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে চোখ রাখল ও। শুধু কণ্ঠস্বর শুনতে চায় ও। নানা ধরনের তথ্য সহ চারদিক থেকে ভেসে আসছে। এক এক করে কণ্ঠস্বরগুলো বাতিল করে দিল ও। নির্দিষ্ট একটা গলার জন্যে সজাগ হয়ে থাকল কান।

বেশিরভাগই ইংরেজিতে কথা বলছে ওরা। কেউ কেউ ফ্রেঞ্চও বলছে। দু'একজন বলছে জার্মান। কেউ গ্রীক বলছে না।

জার্মান বলছে দু'একজন।

প্রথম কণ্ঠস্বরটা পুরুষের, ভরাট। কথা শেষ হবার আগেই নারী কণ্ঠের সুরেলা হাসি, তারপর একই ভাষায় উত্তর। মেয়েটার বাচনভঙ্গি আমেরিকানদের মত, বই পড়ে জার্মান শিখেছে। সন্দেহ নেই নিজেকে জার্মান বলে পরিচয় দিতে গেলে বিপদে পড়বে মেয়েটা।

রানা তাকাল, কিন্তু সরাসরি নয়। এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে চোখ বুলাল ও। তারপর নির্দিষ্ট টেবিলে স্থির হলো দৃষ্টি। কদর্য আর সৌন্দর্যের এই মিলন সহজে চোখে পড়ে না। জার্মান লোকটাকে পৌরাণিক কাহিনীর দানব বললে অন্যায় হবে না। ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো, কাটাকুটির সহস্র দাগে ভরা প্রকাণ্ড মুখ, শুধু ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা ঝরছে না বলে গা ঘিন ঘিন করল না। এই চেহারায় মোহ-মুগ্ধ হাসি যেমন বেমানান তেমনি অশ্লীল। লাইটার জ্বেলে সামনের দিকে ঝুঁকল দানব, মেয়েটার ঠোঁটে ধরা সিগারেট ধরিয়ে দিল।

মেয়েটাকে একপাশ থেকে সম্পূর্ণ দেখতে পেল রানা। শুধু সুরূপা নয়, দেহ-কাঠামোও ঠিক যেন বাংলা সংখ্যা ৪—সম্ভবত ৩৬-২৪-৩৬। মধুর কটাক্ষ হেনে হাসল সে, শিখার মাঝখানে দু'জোড়া চোখের দৃষ্টি এক হলো। দৃষ্টি নয়, যেন অগ্নিবাণ—মনে হলো দানবের শার্টের বোতাম গলে যাবে। আপনমনে হাসল রানা। এ-ধরনের মেয়েকে চেনা আছে ওর। শরীরে যৌবন আসার আগেই পুরুষদের দৃষ্টি কাড়তে শিখে ফেলে, কৈশোরেই অঘটন ঘটন পটিয়সী হয়ে ওঠে, সাহস বাড়ার সাথে সাথে যৌবনে হয়ে ওঠে রাক্ষসী। সমস্ত ঝক্কি পোহাতে হয় বাবাকে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এ বাবা জন্মদাতা বাবা নয়।

বারে সে-ই একমাত্র সম্পূর্ণ কালো ড্রেস পরে আছে। অত্যন্ত দামী একটা ম্যাক্সি। কালোকেশীর চোখ জোড়া হাস্যোজ্জ্বল। কয়েকটা জিনিস কল্পনা করে নিল রানা—নেইলপলিশ আর অন্তর্বাসের রঙ গায়ের সাথে মেলানো, হলুদাভ মাখন।

শরীরের সাথে মানানসই হেঁড়ে গলায় কথা বলছে লোকটা, সম্ভবত মদ্যপান করায় খেয়াল নেই প্রায় সবাই তার কথা শুনতে পাচ্ছে। কথা মানে, তুমি সুন্দর, তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে জীবন ধন্য হলো, এইসব।

নীলনয়না তাকে বলল, আমেরিকান মেয়েরা নারী-স্বাধীনতা ভোগ করছে।

নারী-স্বাধীনতা? মেয়েটা ব্যাখ্যা করল, আমরা এখন আর রান্নাঘরে বন্দী নই।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, তারমানেই অন্য ঘরে সময় কাটাবার সুযোগ বেড়ে গেছে!

মেয়েটার মুখে দুষ্টু হাসি, বলল, সুযোগটা আমরা পুরোমাত্রায় নিচ্ছিও।

সত্যি, ভাবল রানা, এই মেয়ে রান্নাঘরে ব্যস্ত, কল্পনাও করা যায় না। মেয়েটার কথা শুনতে শুনতে আগের ধারণা পাল্টাল ও। আমেরিকান বাচন ভঙ্গি সুন্দর, কিন্তু যথেষ্ট নিখুঁত নয়। আসলে হয়তো জার্মান মেয়ে, ভান করছে আমেরিকান বলে। এমন ভাবে কথা বলছে যেন কোন স্কুলে শিখেছে মাতৃভাষা। মনে মনে আবার একবার হাসল রানা। ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ অন্য কাউকে বোকা বানাতে পারো, ভাবল ও, আমাকে নয়।

চুনি বসানো কানের দুল পরে আছে। হঠাৎ নিষ্পলক হয়ে উঠল রানার দৃষ্টি। পেলব বাহু তুলে কান থেকে একটা দুল খুলে নিল মেয়েটা। দুলটা কয়েক সেকেণ্ড তালুতে নিয়ে দেখল। তারপর আবার পরল কানে।

সঙ্কেতে কোন ভুল নেই। হ্যাঁ, ওর সাথেই দেখা করতে এসেছে রানা। কিন্তু দানবটাকে তাড়াবে কিভাবে?

অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। মন চলে গেল ব্রাসেলসে।

রুটিন ট্যুরে বেরিয়ে বেলজিয়ামে যাত্রাবিরতি, রানা এজেন্সির ব্রাসেলস শাখা ভিজিট করার পর প্ল্যান ছিল ফ্রান্সে চলে যাবে, কিন্তু তা আর হলো না। প্লেনের টিকেট কাটাও হয়ে গিয়েছিল, এই সময় বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে স্বয়ং মেজর

জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের একটা মেসেজ পেল রানা।

মেসেজটা এই রকম:

'সি.আই.এ. খুব নাজুক অবস্থায় পড়েছে। ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল উইলিয়াম অবসন রানা এজেন্সির সাহায্য চান। আমাকে আভাস দেয়া হয়েছে, সমস্যাটা নিয়ে ওদের প্রেসিডেন্টও খুব উদ্বিগ্ন।ব্রাসেলসেই অপেক্ষা করো, ওরা তোমার সাথে যোগাযোগ করবে। ওরা তোমার সাহায্য চায়, এটা গোপন থাকা দরকার। সম্ভব হলে সাহায্য করো। আমার ধারণা, রহস্যের ভেতর রহস্য থাকতে পারে–সাবধান। রা. খা.।'

দু'দিন পরই অশীতিপর এক বৃদ্ধ যোগাযোগ করল রানার সাথে। রাস্তায় দেখা হলো, রাস্তা থেকেই বিদায় নিল লোকটা। পাশাপাশি বিশ মিনিট হাঁটল ওরা, বাক্য এবং কিছু কাগজ-পত্র বিনিময় হলো। মাত্র কয়েকটা তথ্য জানতে পারল রানা। সি.আই.এ. এটাকে ডাবল রেড অ্যালার্ট বলে অভিহিত করছে। এসপিওনাজ জগতে আছে রানা, কাজেই অর্থটা জানা আছে। ডাবল রেড অ্যালার্ট মানে ভয়াবহ পরিস্থিতি–অপারেশন সংক্রান্ত যেকোন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়া ঠেকাবার জন্যে প্রয়োজনে নিরীহ মানুষকেও খুন করা যেতে পারে। রানাকে অনুরোধ করা হলো, এই মুহূর্ত থেকে ও যেন দুনিয়ার সবাইকে অবিশ্বাস করে। সি.আই.এ. বা রানা এজেন্সির কারও সাথে দেখা করা নিষেধ। নতুন পরিচয়পত্র পেল রানা, পেল আমেরিকান পাসপোর্ট আর এথেন্সের ওয়ানওয়ে টিকেট। বলে দেয়া হলো, ওর পরবর্তী কণ্ট্যাক্ট জার্মানভাষী এক কালোকেশী মেয়ে, হোটেল জি.বি.-তে অমুকদিন অমুক সময় ওর সাথে যোগাযোগ করবে সে।

ব্যস, আর কোন তথ্য এখনও পায়নি রানা। কাজটা কি জানে না ও। বসের মেসেজেও সে-সম্পর্কে কোন আভাস ছিল না।

তবে মেসেজের শেষ লাইনটা মনে গেঁথে আছে: রহস্যের ভেতর রহস্য থাকতে পারে—সাবধান।

শেষ চুমুকটা দিয়ে গ্লাস ধরা হাতটা একটু উঁচু করল রানা, ওয়েটারকে ইঙ্গিত করল আবার ভরে দিতে। লক্ষ করল, কালোকেশী ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হলো অনিশ্চয়তায় ভুগছে মেয়েটা। রানার সাথে চোখাচোখি হতে ফিরিয়ে নিল মুখ। খানিক পর আবার একবার তাকাল। জার্মান লোকটা বিল মেটাবার জন্যে পকেটে হাত ভরছে, এই সময় সিদ্ধান্তে এল মেয়েটা। রানা তার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেল।

'মাফ করবেন, প্লীজ, সম্ভবত পরিচিত এক ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি।'

জার্মান লোকটা কিছু বলার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, রানার টেবিলের দিকে এগোল। লম্বা পা, ম্যাক্সির নিচে যতটা দেখা যায় হলদেটে মাখন। হ্যাঁ, মেয়ে হাঁটতে জানে বটে। গুরু নিতে' উথাল পাথাল ঢেউ তুলে এগিয়ে এল সে। 'মাফ করবেন,' টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল রানাকে, 'আপনি কি...,' তারপর নিজের অসমাপ্ত প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিল, 'না, দুঃখিত, আমার ভুল হয়েছে।' অস্বস্তি আর ক্ষমাপ্রার্থনার সুর। 'আপনাকে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল... ।'

স্মিত হেসে রানা বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য যে সে-লোক আমি নই। কিন্তু তাই বলে এসে ফিরে যাবেন?'

নিমেষে মধুর হাসি ফুটে উঠল কালোকেশীর চেহারায়। হাত দুটো এক সেকেণ্ডের জন্যে টেবিলের কিনারা ছুঁলো। 'আমার বন্ধু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বিরক্ত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।'

'কোন ব্যাপারই নয়।'

এভাবেই মেয়েটা ঢুকল এবং বেরিয়ে গেল রানার জীবন

থেকে। রানা ছাড়াও আরও পাঁচ-সাতজন লোক তাকে বেরিয়ে যেতে দেখল বার থেকে। আর সবার মত মৃদু হাসল রানা, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কারণে। মেয়েটার দেহ-সৌষ্ঠব ওর নজর কাড়লেও, ওকে মুগ্ধ করেছে তার গোপন আচরণটুকু। কারও চোখে ধরা না পড়ে কৌশলে টেবিলের ওপর ফেলে গেছে ভাঁজ করা খুদে একটা কাগজ। দরজার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে এক হাত দিয়ে গ্লাস তুলল ও, আরেক হাত ভরল পকেটে। পকেট থেকে হাতটা বেরুল সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিল ও। গ্লাসটা শেষ করতে হবে।

বিশ মিনিট পর। হোটেল থেকে বেরিয়ে রানা দেখল সন্ধে হয়ে গেছে। চৌরাস্তায় কাফে আর বার সবগুলো লোকে লোকারণ্য। রাস্তায় যানবাহনের তেমন ভিড় নেই, তবে ফুটপাথে পরস্পরের হাত ধরা প্রেমিক প্রেমিকাদের জন্যে হাঁটা মুশকিল। ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল রানা, মায়াবতী রমণীর মত কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল ফুরফুরে বাতাস। আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিসকে পাশ কাটাল ও। একটা বুকস্টলের সামনে থামল, চোখ বুলাল খবরের কাগজের হেডলাইনগুলোয়। তারপর রাস্তা পেরিয়ে এরমু স্ট্রীটে চলে এল। ধীর পায়ে, অলসভঙ্গিতে হাঁটছে। হাত দুটো পকেটে। এথেন্সে এই সময় সচরাচর যেমন দেখা যায়, আরেকজন গোবেচারা ট্যুরিস্ট। খানিকদূর এগিয়ে নিশ্চিত হলো রানা, কেউ ওর পিছু নেয়নি। বাঁ দিকে মোড় নিল ও। তারপর হঠাৎ ডান দিকের অন্ধকার মত রাস্তায় ঢুকে পড়ল। পেত্রাকি স্ট্রীট—লোকজন নেই বললেই চলে।

স্ট্রীট লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল রানা। এই সুযোগে ভাঁজ করা কাগজটা বের করল। ভাঁজ খুলে মেসেজটা পড়ল ও। এক লাইনের একটা মেসেজ। '৮ ন'র কিরিস্তু স্ট্রীট,

সকাল আটটায় সেন্ট পলের আইকন খোঁজ করো।'

আবার হাঁটা ধরল রানা। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল কাগজটা, ফেলে দিল নর্দমায়।

মনোরম সকালে গ্রান্দ বেতানের বিলাসবহুল স্যুইটে ঘুম ভাঙল রানার। উনিশ তলার কার্নিসে সার সার টব, লতাগাছগুলো মোজাইক দেয়াল প্রায় ঢেকে ফেলেছে। তারই ভেতর লুকানো আছে স্পীকার, পাখির কুজন ধ্বনি সারা শরীরে মধুর আবেশ এনে দিল। ঘুম ভাঙাবার এই কায়দা যান্ত্রিক হলেও, রোমাঞ্চকর লাগল রানার, মনে মনে হোটেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না।

রূম সার্ভিসকে ফোনে ডেকে বাথরূম আর শাওয়ার সারল রানা। তারপর দাড়ি কামাল। প্রজাপতি আঁকা বড় একটা টাওয়েলে কোমর ঢেকে লিভিং রূমে ঢুকল ও, এবং ঢুকেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রায় উলঙ্গই বলা যায়, দেবী মূর্তি। ঘরের মাঝখানে নয়, দেয়াল ঘেঁষে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন একটা গ্রীক মাস্টারপীস। মেয়েটার চোখের পাতা নড়ছে দেখে আটকে যাওয়া নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে ছাড়ল রানা।

'রূম সার্ভিস,' চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক তুলে হাসল মেয়েটা। রানার আড়ষ্ট ভাবটা দারুণ উপভোগ করছে। 'আপনার ব্রেকফাস্ট সিটিং রূমে দেয়া হয়েছে।'

সদ্য কামানো গালে হাত বুলিয়ে মৃদু হাসল রানা। 'ধন্যবাদ।'

মেয়েটা নড়ল না। 'আর কিছু দরকার হবে আপনার? গাড়ি? কোন চিঠি ডাকে ফেলতে হবে? কিংবা যদি কিছু কেনার থাকে। গাইডের দরকার হলেও বলতে পারেন...।' রানার লোমশ, চওড়া বুকের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল সে।

'না।' সিটিং রূমের দরজার দিকে একবার তাকাল রানা। 'এথেন্সে আমি নতুন নই। ধন্যবাদ।'

'ডাকলেই আমাকে পাবেন,' দেবী মূর্তি দরজার দিকে এগোল। 'আমিই আপনার রূম সার্ভিস।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে কোমর থেকে তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা। সিটিং রূমে ঢুকে দেখল, টেবিলের পাশে চাকা লাগানো ট্রে-তে সাজানো রয়েছে ব্রেকফাস্ট। খিদেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। চেয়ারে বসে ট্রে-র ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

রসনাতৃপ্তির পর কফি নিয়ে সোফায় বসল ও, তেপয়ে মেলে ধরল কাল রাতে কেনা। এথেন্সের ম্যাপ। শহরের প্রতিটি এভিনিউ চওড়া আর সরল, আর সবগুলো গলি-উপগলি আঁকাবাঁকা। কিরিস্তু স্ট্রীট কোন্ দিকে ভুলে গেছে ও। খুঁজে বের করতে পাঁচ মিনিট লেগে গেল। প্লাকা হচ্ছে এথেন্সের পুরানো-ঢাকা, ওল্ড টাউন। অ্যাক্রোপোলিস পাহাড়ের গোড়ায় ঘিঞ্জি একটা এলাকা। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে সিদ্ধান্ত নিল, হাঁটবে। সকালের রোদে শহরের ওপর ঝুঁকে থাকা অ্যাক্রোপোলিসকে ভালই লাগবে দেখতে।

আমেরিকান ট্যুরিস্টদের মত শিস দিতে দিতে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। সিনট্যাগমা চৌরাস্তার দিকে এগোল ও, কাল রাতে এখান দিয়েই খানিকদূর গিয়েছিল। গাছপালার নিচে কাফেগুলো এখন খালি। প্রেমিক-প্রেমিকারাও উধাও। বছরের এই সময়টায় গ্রীকদের প্রতি সদয় থাকেন অ্যাপোলো, মৃদুমন্দ বাতাস বইতে দিয়ে রোদের ধার খানিকটা ভোঁতা করে রাখেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে তেতে উঠবে রোদ। মুখ তুলে পাহাড় চূড়ার দিকে তাকাল রানা, কয়েক শতাব্দী ধরে লোকজন বসবাস করছে ওখানে।

ধীরে ধীরে রাস্তা-ঘাটে শহুরে ব্যস্ততা বাড়ছে। নতুন শহর

পেরিয়ে এল রানা। প্লাকা-য় ঢুকতেই চারদিকের দৃশ্য বদলে গেল। মান্ধাতা আমলের সাদা চুনকাম করা বাড়ি, জুতোর বাক্স আকৃতির ইমারত, আঁকাবাঁকা রাস্তার ওপর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একের পর এক। এখানে রোদ নেই, বাতাসের প্রবেশ নিষেধ। রাস্তার দু'পাশে সার সার দোকান, কিন্তু প্রায় সবগুলোই বন্ধ। পরিত্যক্ত, নির্জন রাস্তা। শুধু বাচ্চা দুটো ছেলে মার্বেল নিয়ে খেলছে এক ধারে। দোতলার এক ছাদে চোখ পড়ল রানার। দুটো রুমাল দিয়ে কোমর আর বুক ঢাকা এক মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পাপোশ ঝাড়ছে। এত বাড়ি-ঘর, অথচ একেবারে নির্জন এলাকা। যেন শহর ছেড়ে সবাই পালিয়েছে।

কিন্তু সন্ধ্যার পরপরই জ্যান্ত হয়ে ওঠে প্লাকা। পুরানো শহরের তখন অন্য চেহারা। দোকানদাররা তখন ফুটপাথেও তাদের পসরা সাজায়। প্রতিটি জানালার ওপাশ থেকে ভেসে আসে গান-বাজনার আওয়াজ। ফুর্তিবাজ লোকেরা দলে দলে ঢুকে পড়ে গলির ভেতর, সেন্টে প্রায় ভিজে থাকে তাদের জামা। কারও এক হাতে থাকে মদের বোতল, আরেক হাত থাকে কোন সুন্দরী যুবতীর কোমর পেঁচিয়ে। প্রতিটি বারে জুয়ার আড্ডা বসে। পানাহার, এবং যৌন লীলার অবাধ অনুশীলন চলে সারারাত, সেই ভোর পর্যন্ত। তারপর যে যার ঠিকানায় ফিরে যায়, নির্জীব পড়ে ধোঁকে পরিত্যক্ত প্লাকা।

প্লাতিয়া মেট্রোপোলিয়স-এর কাছে অর্থোডক্স ক্যাথেড্রাল পেরিয়ে এল রানা, বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল ম্লিসিক্লিয়স স্ট্রীটে। সামনে সরু রাস্তা সিঁড়ির আকৃতি নিয়ে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। এখানে প্রাণী বলতে একজোড়া বিড়ালকে শুধু দেখতে পেল রানা। ধাপগুলোর মাথা থেকে শুরু হয়েছে সরু একটা গলি, অ্যাগোরা ধ্বংসাবশেষের কিনারা ঘেঁষে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে পাহাড়ের

দিকে। আরও সামনে দেখা গেল প্রায় খাড়া পাহাড়ের ঢাল। সেদিকে না গিয়ে অন্য দিকে বাঁক নিয়ে কিরিস্তু স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল রানা।

হোটেল আর দোকানের মাঝখানে আট ন'র বাড়ি, সাদা চুনকাম করা। হোটেলের দরজা খোলা, কিন্তু লোকজন দেখা গেল না। দোকানটা বন্ধ। বাড়ির দরজায় একটা সাইনবোর্ড রয়েছে—এখানে অ্যান্টিকস বিক্রি হয়। দরজায় নক করতে গিয়েও করল না রানা, ঠেলা দিতেই কবাট খুলে গেল। কাউকে দেখার আগেই অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'সুপ্রভাত।'

'সুপ্রভাত,' জবাব দিল রানা।

ঘরের ভেতর থেকে দরজার কাছে এসে থামল এক শক্ত-সমর্থ লোক। বয়স হবে পঞ্চাশের মত, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, রোদেপোড়া গ্রীক জেলেদের মত চেহারা। লোকটাকে ছাড়িয়ে রানার দৃষ্টি সামনে চলে গেল। আবছা আলোয় অ্যান্টিক জিনিস-পত্র দেখা গেল কয়েকটা র‍্যাকে। দেব-দেবীর খুদে মূর্তি থেকে শুরু করে হাতে রঙ করা ফুলদানী, সবই আছে। র‍্যাকের পিছনের দেয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো রাজা কনস্ট্যানটিন এবং তাঁর ডেনিশ বধূর ছবি।

লম্বা কাউন্টারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। ভেতরে ঢুকে রানা বলল, 'আপনি বোধহয় আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। সেন্ট পলের আইকন খুঁজছি আমি।'

সবজান্তার হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোকটার মুখ। এ-ধরনের হালকা হাসি আশা করেনি রানা। লোকটা যে ওর কণ্ট্যাক্ট নয়, এটুকু পরিষ্কার। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার নিরীহ অভাবগ্রস্তদের একজন সে, আসল ব্যাপার কিছু না জেনেই সি.আই.এ-র খুদে ঘুঁটি হিসেবে কাজ করে। এদের বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত, তা না হলে কাজ পেত না। হঠাৎ করে

কালোকেশীর চেহারাটা মনে পড়ে গেল রানার। উঁহু, মেয়েটা নিরীহদের একজন নয়। তারমানে বিশ্বস্ততা ছাড়াও আরও অনেক গুণ আছে তার। হাসতে হাসতে বুকে ছুরি চালাতে পারে। বিষ মিশিয়ে সহাস্যে শয্যাসঙ্গীর হাতে তুলে দিতে পারে মদের গ্লাস।

'আমি ডাকান,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল লোকটা। 'আপনি যা খুঁজছেন ওপর তলায় পাবেন।'

লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে কাঠের এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখতে পেল রানা। সিঁড়ির মাথায় দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে। নিশ্চয়ই কারও ভুলে নয়।

'উঠে যান,' আবার বলল লোকটা। 'তাঁকে আমি দেখিনি, তবে জানি ওখানে তিনি আছেন।'

তিনি আছেন! তারমানে কি একজন? কিন্তু ডাকান যদি দেখে না থাকে, জানবে কিভাবে ক'জন আছে?

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করে জ্যাকেটের বোতাম খুলে ফেলল রানা। রিভলভারটা কোমরের বেল্টে রয়েছে, নিচের দিকে মুখ করে। আগ্নেয়াস্ত্র বিশ্বস্ত বন্ধুর মত, স্পর্শেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। সিঁড়ির মাথায় উঠে থামল রানা, আস্তে করে চাপ দিল কবাটে। দরজার ভেতর ঘরটা প্রায় অন্ধকার, জানালাগুলোয় ভারী পর্দা ঝুলছে। এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে সার সার বেঢপ আকৃতি দেখা গেল, ছোট বড় কাঠের বাক্স ওগুলো। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, আর একটা চেয়ার। উল্টোদিকে আরেকটা দরজা, ক্ষীণ আলোর আভা ঢুকছে ভেতরে। সম্ভবত ওদিকেও একটা সিঁড়ি আছে, সরাসরি রাস্তায় নামা যায়।

লোকটাকে আগেই দেখেছে রানা, টেবিলের সামনে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। শাটার আর পর্দা লাগানো জানালার সামনে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি। বেশ লম্বা, একহারা গড়নের। নাক-চোখ কিছুই দেখা গেল না।

ভেতরে ঢুকে পেছনে হাত বাড়িয়ে দরজা বন্ধ করল রানা। ভাপসা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। অন্ধকার থেকে কথা বলে উঠল লোকটা, 'গুডমর্নিং, রানা।'

কণ্ঠস্বরটা রানার স্মৃতির ভাণ্ডারে একটা আলোড়ন তুলল, কিন্তু চেষ্টা করেও লোকটাকে চিনতে পারল না। 'আলোকে এত ভয় কেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'সাবধানের মার নেই,' বলল লোকটা। এক চুল নড়ছে না সে। 'কাছে এসো। তোমার মুখ দেখতে দাও।'

চুপ করে থাকল রানা। একমুহূর্ত নড়ল না। দু'জনের মাঝখানের দূরত্বটুকু আরেকবার মেপে নিল। তারপর দরজার কাছ থেকে ধীর পায়ে, সাবধানে সামনে বাড়ল। টেবিলের কাছ থেকে সারাক্ষণ দূরে থাকল ও, টেবিল ঘুরে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে ভারী পর্দা সামান্য একটু সরাতেই দিনের আলো ঢুকল ঘরে। লোকটার চেহারা পরিষ্কার দেখা গেল এবার। বিস্মিত হলো রানা, কিন্তু চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতে দিল না। 'ডিকসন, ইউ বাস্টার্ড!' জানালার পর্দা আবার টেনে দিল রানা।

রড ডিকসন এথেন্সের মার্কিন দূতাবাসে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ওই ধরনের ছোট একটা চাকরি করে, অন্তত শেষবার রানার সাথে দেখা হওয়ার সময় তাই করত। পয়সার বিনিময়ে তথ্যের জন্যে ডিকসনের মত জুনিয়র গ্রেড অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় রানা এজেন্সিকে। ডিকসনের আয়ের দুটো উৎস সম্পর্কে জানে রানা। একটা চেক আসে ইউ.এস. আর্মির ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে। ব্রাঞ্চের মাথা-খারাপ কর্তাব্যক্তিরা এ-ধরনের লোককে দিয়ে উল্লট সব কাজ করিয়ে নেয়। অন্তত একটা কাজের কথা রানার জানা আছে, ডিকসনই জানিয়েছিল। হুইস্কির খালি বোতলে কম্যুনিজম বিরোধী প্রচার-পত্র ভরে দানিয়ুব নদীতে ছেড়ে দিত ডিকসন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশা

ছিল, স্রোতে ভাসতে ভাসতে রাশিয়ার উপকূলে চলে যাবে ওগুলো, দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা উদ্ধার করবে, এবং মেসেজ পড়ে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। ঘটনাটা শোনার পর রানা মন্তব্য করেছিল, বেকুব কি আর গাছে ধরে! ডিকসনের আয়ের আরও একটা উৎস হলো, এমসিক্সটিন–ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। আয়ের আরও উৎস তার থাকতে পারে, ঠিক জানা নেই রানার। লোকটা দু'হাতে টাকা ওড়ায়। একটু সন্দেহের চোখেই দেখে ও। যদি শোনে পয়সা খেয়ে শত্রু পক্ষের হয়ে কাজ করছে, অবাক হবে না।

'পুরানো বন্ধুকে এভাবে কেউ সম্বোধন করে না,' রাগ নয়, অভিমানের সুরে বলল ডিকসন।

'ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও যে তোমাকে আমি মেরে ফেলিনি।' পকেট থেকে এক প্যাকেট গ্রীক সিগারেট বের করল রানা।

লাইটার জ্বেলে রানার সিগারেট ধরিয়ে দিল ডিকসন। রানার মনে পড়ল, ছোটখাট তথ্যের জন্যে এক সময় প্রচুর টাকা খেয়েছে ডিকসন ওর কাছ থেকে। মাথা নিচু করে ছোট একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালল ডিকসন। ল্যাম্পটা সস্তাদরের অ্যান্টিক। সলতে একটু লম্বা করল সে, কাঁপতে লাগল শিখা। 'একে ঠিক সাবধানতা বলে না, তুমি যেন কিসের ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছ,' লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রানা।

'বসো,' ইঙ্গিতে চেয়ারটা দেখাল ডিকসন। 'না, ভয়ের কি আছে। তবে স্বীকার করছি, কাজটা আমার তেমন পছন্দ হয়নি। কাজ তেমন কিছুই নয়, অথচ কোটিবার সাবধান থাকতে বলে দেয়া হয়েছে আমাকে। ল্যাম্পের আলো বাইরে থেকে দেখা যাবে না। সিলিঙের বালব্ জ্বাললে দেখা যাবে।' একটু থেমে আরেক প্রসঙ্গে চলে গেল, 'জানা না থাকলে ধরতেই পারতাম না তুমি রানা।'

মিথ্যে কথা। জানালার বাইরে সাদা চুনকাম করা দেয়ালে চোখ ধাঁধানো রোদ পড়েছে, বালবের আলো কেউ দেখতেই পাবে না। তবু তর্কের মধ্যে গেল না রানা। লক্ষ করল, বেঢপ একটা ভুঁড়ি বাগাতে শুরু করেছে ডিকসন। মাথায় চুলও আগের চেয়ে কম মনে হলো। ডিকসনের চেহারায় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই, সিকিউরিটি এজেন্টদের চেহারা ঠিক এরকমই হওয়া উচিত। সারারাত লোকটার সাথে বসে মদ খেলেও পরদিন সকালে চেহারাটা স্মরণ করা কঠিন। ছোট করে ছাঁটা চুল। পরনে গাঢ় রঙের কনজারভেটিভ স্যুট। তবে এথেন্সের বহুলোকই আবছাভাবে হলেও জানে লোকটা আসলে কি। ডিকসন অতিরিক্ত সাবধান হওয়ায় একদিক থেকে ভালই হয়েছে, ভাবল রানা। ওর সাথে লোকে তাকে প্রকাশ্যে না দেখলেই ভাল।

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। 'বলো, কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'আমার কিছু চাইবার নেই, দেবার আছে।' দেরাজ থেকে একটা লেদার পাউচ বের করল ডিকসন, দু'জনের মাঝখানে টেবিলের ওপর রাখল সেটা। ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'একই পার্টির কাজ করছি আমরা।'

'কোন্ পার্টি?'

ঘুরিয়ে উত্তর দিল ডিকসন, 'পিটার ডানিয়েল আমাকে পাঠিয়েছে।'

শ্রাগ করল রানা।

'ডানিয়েল তোমাকে অধৈর্য না হতে অনুরোধ করেছে।'

ডানিয়েলকে রানা চেনে না, অন্তত এই নামে চেনে না। 'বলে যাও, আমি শুনছি।'

'তোমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে এটা,' বলে থামল ডিকসন, পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল।

'কাজেই মুখ খুললে নিজেরই বিপদ ডেকে আনবে।'

'এ-ধরনের প্রলাপ শোনার জন্যে আসিনি আমি,' ধমকে উঠল রানা। 'কাজের কথা থাকলে চটপট...'

'ডানিয়েল যা বলতে বলেছে তাই বলছি আমি,' বাধা দিল ডিকসন। 'গোটা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট, কাজেই তোমার নতুন পরিচয় কোন শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু-বান্ধব, সহকারী সহকর্মী কাউকে জানানো চলবে না। সেজন্যেই ওরা নিজেদের লোক না পাঠিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে।'

'রানা এজেন্সির বেশিরভাগ কেস-ই টপ সিক্রেট,' বলল রানা। 'আর ছদ্মবেশের কথা যদি বলো, চেষ্টা করলে এজেন্সির এজেন্টরা ঠিকই আমার নতুন পরিচয় জেনে ফেলবে... ।'

আবার বাধা দিল ডিকসন, 'তোমার বুঝি তাই ধারণা?' বিষণ্ন একটু হাসি দেখা গেল তার মুখে, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল একবার। 'যদি বলি কেউ আর চেষ্টাই করবে না? এখন থেকে দশ মিনিট পর সংশ্লিষ্ট সবাই জানবে, বারো ঘণ্টা আগে মারা গেছে মাসুদ রানা।'

চুপ করে থাকল রানা। সিগারেটে টান দিল। ব্যাখ্যার জন্যে অপেক্ষা করছে।

'রেকর্ডে দেখা যাবে, কাল সকালে ব্রাসেলস ত্যাগ করেছ তুমি, অসলো-য় ল্যাণ্ড করেছ, কাস্টমস শেড থেকে বেরিয়ে একটা গাড়িতে চড়েছ। হোটেলে যাওয়ার পথে তোমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে। স্থানীয় হাসপাতালে দু'ঘণ্টা পর মারা যাও তুমি।'

'প্রচুর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে, সন্দেহ নেই,' বলল রানা। ভাবল, কে সেই ভাগ্যবান, ওর বদলে লাশ হতে হলো যাকে?

'গাড়িটা ছিল একটা রেন্ট-এ-কার কোম্পানির—তুমি নিজে ভাড়া করেছিলে।'

'অবশ্যই।'

'আসলে বলতে চাইছি, গোটা ব্যাপারটা অফিশিয়াল—কোথাও কোন খুঁত রাখা হয়নি। মাসুদ রানা মারা গেছে। পোস্ট মর্টেমের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঢাকাতেও পৌঁছে গেছে খবরটা, সম্ভবত এরই মধ্যে ক্লোজ করে দেয়া হয়েছে তোমার ফাইল। তোমার সম্পর্কে শত্রু এবং মিত্রদের কাছে আরও অনেক ফাইল আছে, সেগুলোও ক্লোজ হতে শুরু করেছে। কেউ যদি সন্দেহের বশে তোমার খোঁজ-খবর পাবার চেষ্টা করে, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও কোথাও কোন সূত্র পাবে না বেচারা।'

'বুদ্ধিটা কার?' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা। 'জিজ্ঞেস না করেই মেরে ফেলল আমাকে?'

'তোমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার বসের কাছ থেকে নিশ্চয়ই অনুমতি নেয়া হয়েছে,' বলল ডিকসন। 'ডানিয়েল তোমাকে বলতে বলেছে, কাজের ধরনটা এমনই যে সতর্ক হবার জন্যে এ-ধরনের আয়োজন একান্ত দরকার ছিল, তুমি যেন মাইণ্ড না করো।'

'হুঁ।'

রানার অসহায়বোধটুকু উপভোগ করছে ডিকসন। অভ্যস্ত নয়, কর্তৃত্বের ভাব চেহারায় মানাচ্ছে না। প্রশ্ন আশা করলেও, রানা তার আশা পূরণ করল না। জানে, ও চুপ করে থাকলেই বেশি কথা বলবে ডিকসন।

'আজ বিকেলে এথেন্স ছেড়ে যাচ্ছ তুমি,' বলল ডিকসন। লেদার পাউচ খুলে ভেতর থেকে একটা এনভেলাপ বের করল সে, টেবিলের ওপর রাখল। এনভেলাপের ভেতর একটা সুইডিশ পাসপোর্ট পেল রানা। অটো এমারসন, ফার ব্যবসায়ী। কিছু চিঠিপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সুন্দরী এক মহিলার সাথে ফুটফুটে দুটো বাচ্চার ওয়ালেট সাইজ ফটো, ইত্যাদি রয়েছে।

'বাচ্চা দুটো তোমার, ওদের মা তোমার স্ত্রী,' বলল ডিকসন। 'সুখী একটা পরিবার।'

সবশেষে এনভেলাপ থেকে একটা প্লেনের টিকেট বেরুল, এথেন্স থেকে লণ্ডনের। আজ বিকেলের ফ্লাইট।

'তোমার যা যা দরকার হবে, সব যোগাড় করেছি আমি,' বলল ডিকসন। 'জি.বি-তে ফিরে গিয়ে নতুন কাপড়চোপড় দেখতে পাবে। সবই স্টকহোম থেকে কেনা হয়েছে—লাগেজ, শেভিং গিয়ার, সমস্ত কিছু। এমনকি একটা উপন্যাসও পাবে, এই মুহূর্তে সুইডেনকে গরম করে রেখেছে।'

'হুঁ।'

'তুমি চলে যাবার পর এদিকের সব পরিষ্কার করে ফেলব আমি। এথেন্সে তুমি যা কিছু কিনেছ, সব ফেলে যাবে। এমন কিছু তোমার সাথে থাকা চলবে না যা দেখে বোঝা যায় তুমি মাসুদ রানা। আশা করি এদিকটা তুমি লক্ষ রাখবে।'

'তারপর, লণ্ডনে পৌঁছুলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পিকাডেলি-র অ্যামব্যাসাডর হোটেলে উঠবে। তারপর কি ঘটবে আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। এই পর্যন্তই আমার দৌড়।'

তিন

পিছনের দেয়াল ঘড়ি দেখার জন্যে চেয়ারে মোচড় খেলো হফ ভ্যানডেরবার্গ। রাগে চোখমুখ লাল হয়ে উঠল বুড়োর। পাশে

দাঁড়ানো যুবকের দিকে ফিরল সে, কটমট করে তাকাল। ‘কি ঘটছে খবর নাও!’ কড়া ধমকের সুরে হুকুম করল সে। ‘এরা আমাদের ভেবেছে কি!’

‘ওস্তাদ…,’ শুরু করল এডলফ ডয়েট।

চোখে আগুন ঝরা দৃষ্টি নিয়ে হাতের লম্বা ছড়িটা মাথার ওপর তুলল ভ্যানডেরবার্গ, মারবে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ডয়েটের, ডিপারচার লাউঞ্জ ধরে ত্রস্ত পায়ে ডেস্কের দিকে এগোল সে। লোকজনের সামনে ওস্তাদের এ-ধরনের অপমানকর আচরণ গা সয়ে গেছে তার। ওস্তাদ পৃথিবীর সেরা বেহালাবাদকদের একজন, তা না হলে কবেই এই চাকরি ছেড়ে দিত।

ডেস্কের পিছনে একটা মেয়ে আর একজন পুরুষ বসে আছে, পরনে খয়েরি ইউনিফর্ম। তালিকা মিলিয়ে এরাই আরোহীদের ভেতরে ঢুকিয়েছে। কাজ শেষ, সময় কাটছে একঘেয়ে।

অনেকক্ষণ হলো অপেক্ষা করিয়ে রাখা হয়েছে আরোহীদের, সবাই তারা ভিয়েনা ত্যাগ করে যাবে। প্রত্যেকে অসন্তুষ্ট, কিন্তু কারও কিছু করার নেই।

ডয়েটকে আসতে দেখে ডেস্কের পিছনে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল ওরা।

দু'চারটে কথা ভ্যানডেরবার্গের কানে ঢুকল, ‘ভয়ানক দুঃখিত…দুর্ভাগ্য, করার কিছু নেই…ওস্তাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?…আমাদের ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারদের জন্যে আলাদা লাউঞ্জ আছে… ।’

মনে মনে তিক্ত হাসল ভ্যানডেরবার্গ। লাউঞ্জে যদি সত্যি সত্যি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের জায়গা হত, উৎসাহ বোধ করত সে। কিন্তু এয়ারলাইন কোম্পানিগুলোর বিচারে যে আরোহী যত বেশি মাইল পাড়ি দেবে তার মর্যাদা তত বেশি। কুকুর-বিড়ালও ভি.আই.পি. লাউঞ্জে ঢোকার সুযোগ পাবে যদি তাদের নামে প্রথম

শ্রেণীর লম্বা জার্নির টিকেট কাটা হয়। এখানে ব্যক্তিত্ব, বংশগৌরব, বা খ্যাতির কোন মূল্য নেই। যে-কেউ যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। ভি.আই.পি. লাউঞ্জ তো নয়, গোয়ালঘর। গেলে হয়তো দেখা যাবে কদর্য চেহারার ইহুদিরা হাত-পা ছড়িয়ে বসে ব্যবসা নিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। দুনিয়ার সব বড় বড় ব্যবসাই তো এখন ওদের হাতে। অসহ্য!

অতীতের কথা মনে পড়ল ভ্যানডেরবার্গের। ভ্রমণে তখন সত্যি আনন্দ ছিল। ট্রেনগুলো ছিল ধীরগতি, কিন্তু পৌঁছুতে সময়ের হেরফের হত না। ট্রেনে দু'ধরনের কার থাকত—সাধারণ লোকেরা অভিজাতদের কারে ঢুকতে পারত না।

আকাশ ভ্রমণের যুগে সব কিছু বদলে গেছে। তার মত আরোহীরা বিশেষ মর্যাদা হারিয়েছে। প্রথম শ্রেণীর টিকেট কাটলেও আজকাল তেমন সুযোগ-সুবিধে জোটে না—বিনা পয়সায় ককটেল খেতে দেয়, আর সীট একটু চওড়া, ব্যস। বিমান কোম্পানিগুলো ব্যক্তি বিশেষকে খাতির করে না, সমষ্টিকে নিয়েই তারা ব্যস্ত। ছোট বড় সবার সাথে একই আচরণ করে। 'কোথায় যাবেন, স্যার? নিউ ইয়র্ক? এই নিন।' ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক। কমপিউটর থেকে তোমার টিকেট বেরিয়ে এল। 'দুঃখিত, স্যার, আপনার ব্যাগগুলো খুলে দেখতে হবে। একটু যদি এদিকে সরে এসে দাঁড়ান।' ক্লিক, ক্লিক। মেশিন জানিয়ে দিল, তোমার পকেটে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, জুতোর তলায় তুমি বোমা নিয়ে যাচ্ছ না।

কি স্পর্ধা! জিজ্ঞেস করে সাথে পিস্তল বা বোমা আছে কিনা!

হ্যাঁ, ভ্রমণের জন্যে ট্রেনই ভ্যানডেরবার্গের প্রিয়, কিন্তু অস্ট্রীয়া আর আমেরিকার মাঝখানে ট্রেন চলে না। মাত্র দশ দিনের জন্যে মার্কিন মুলুকে যাচ্ছে সে, সাতটা শহরে অনুষ্ঠান করবে, সেখানেও ট্রেনে উঠলে সময়ে কুলাবে না। তাছাড়া, ভ্যানডেরবার্গ শুনেছে,

আমেরিকান ট্রেনও নাকি এয়ারলাইনগুলোর মত, গুণী লোকদের বিশেষ কোন খাতির নেই।

কাজেই প্লেনে না চড়ে উপায় নেই তার।

তবে, অন্তত একটা ব্যাপারে, নিজের প্রাপ্য সম্মান আদায় করে নিয়েছে সে। অন্য কোন আরোহী হলে এই সুবিধেটুকু দেয়া হত না, প্রথমে তাকেও রাজি হয়নি দিতে। কিন্তু জেদ করায় কাজ হয়েছে, ওকে আর ঘাঁটাতে সাহস পায়নি। ব্যাগগুলোর সাথে বেহালাটাও কনভেয়র বেল্টে রাখতে বলা হয়েছিল, ভ্যানডেরবার্গ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, 'তা সম্ভব নয়। ওটা তোমরা হাতে করে বয়ে নিয়ে যাবে।' ব্যাপারটা নিয়ে খানিকক্ষণ তর্ক হলো। দু'জন মহিলা এয়ারপোর্ট কর্মী নাছোড়বান্দা, বেহালাটা তারা বেল্টে তুলে দিতে চায়। কারও বোঝা বহন করার চাকরি নয় তাদের।

যুক্তিতে হেরে গিয়ে স্বমূর্তি ধারণ করল ভ্যানডেরবার্গ, মারবে বলে মাথার ওপর ছড়ি তুলল সে। অপমানে, ভয়ে চেঁচামেচি শুরু করল মহিলারা। পুরুষ কর্মীরা ছুটে এল তাড়াতাড়ি। অনেক কষ্টে স্বনামধন্য ওস্তাদকে শান্ত করল তারা। তাদের একজন বেহালাটা হাতে নিল, ভ্যানডেরবার্গ হুমকি দিয়ে বলল, 'সাবধান! আমার বেহালার যদি কিছু হয়, অনশন করব আমি!' কর্মী লোকটা বেহালাটাকে এমন ভাবে ধরল, যেন একটা বোমা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাশে ফিরে এল এডলফ ডয়েট। 'আর বেশি দেরি হবে না, ওস্তাদ।'

'বিশ মিনিট আগেও এই কথা বলেছে ওরা!'

'আমার ধারণা এবার বোধহয় সত্যি...'

'ধারণার জন্যে নয়, তোমাকে আমি বেতন দিই,' ঝাঁঝের সাথে বলল ভ্যানডেরবার্গ, 'কোথাও কোন সমস্যা হলে সেটা দূর

করার জন্যে। আমাকে দেরি করানো হচ্ছে। অথচ এর কোন ব্যাখ্যা নেই!'

'ব্যাপারটা, ওরা বলছে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত... ।'

'নিরাপত্তা? ঘোড়ার আণ্ডা! নিজেদের অযোগ্যতা চাপা দেয়ার জন্যে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে ওরা।' আড়চোখে ডয়েটের দিকে তাকাল ভ্যানডেরবার্গ। 'না, তোমার বোধহয় কোন দোষ নেই।'

ডয়েট কিছু বলতে গেল, তাকে থামিয়ে দিল ভ্যানডেরবার্গ। 'থাক। অপেক্ষা যখন করতেই হবে, সময়টা বরং কাজে লাগাই এসো। প্রোগ্রাম লেখা কাগজটা দাও আমাকে।'

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল ডয়েট। ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল ভ্যানডেরবার্গ।

ওস্তাদ কাগজটা পড়ায় মন দিতে ধীরে ধীরে, প্রায় নিঃশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডয়েট। খানিকক্ষণ অন্তত শান্তিতে থাকা যাবে।

চোখ কুঁচকে কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ল ভ্যানডেরবার্গ। প্রথম অনুষ্ঠান নিউ ইয়র্ক সিটির ফিশার হলে। তারপর শিকাগো, ডেনভার, আর লস এঞ্জেলেস-এ যেতে হবে। পর পর তিনটে অনুষ্ঠান শেষ করে একদিনের বিরতি, তারপর আবার হিউস্টন আর আটলাণ্টায় বাজাবে সে। সবশেষে বাজাবে ওয়াশিংটন ডিসি-তে। হোয়াইট হাউসের এই অনুষ্ঠানটা হবে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানের জন্যেই তার আমেরিকায় যাওয়া।

ট্যারা চোখে ডয়েটের দিকে তাকাল সে। 'ওয়াশিংটনে আমরা কি ফুটপাথে থাকব? তোমাকে হোটেল রিজার্ভ করতে বলিনি আমি?'

'না, স্যার, হোটেল বোধহয় লাগবে না,' তাড়াতাড়ি বলল ডয়েট। কথাটা আগেও ওস্তাদকে জানিয়েছে সে। ওস্তাদ ভুলে গেছেন, একথা সে বিশ্বাস করে না। বারবার শুনতে ভাল লাগে,

বোধহয় সেজন্যেই জিজ্ঞেস করছেন। 'আমেরিকার প্রেসিডেন্ট,' জোর গলায় বলল সে, জানে আশপাশের সবাইকে শোনালে ওস্তাদ বেশি খুশি হবেন, 'চেয়েছিলেন আপনি যেন ব্লেয়ার হাউসে ওঠেন। ব্লেয়ার হাউস হলো সরকারি অতিথি ভবন... ।'

'ব্লেয়ার হাউস কি আমি জানি!' চোখ পাকাল ভ্যানডেরবার্গ। 'কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতা আমার একদম পছন্দ নয়!'

গলা খাদে নামাল ডয়েট, 'শিডিউল নিয়ে গোলমাল, স্যার। সরকারি সফরে একজন প্রধানমন্ত্রী আসছেন ওয়াশিংটনে, তাই...'

আগের দিন আর নেই, ভাবল ভ্যানডেরবার্গ। গুণী লোকদের চেয়ে গুণ্ডা-পাণ্ডাদের দাম আজকাল অনেক বেশি। রাজনীতিতে আজকাল দু'ধরনের লোক রয়েছে—একদল সাধারণ মানুষকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে নির্বাচিত হয়, আরেকদল গায়ের জোরে ক্ষমতা কেড়ে নেয়—দু'দলের কারও মধ্যেই নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা নেই, কেউ তারা জনগণের ভাল চায় না। ওদের না আছে ব্যক্তিত্ব, না আছে মহৎ কোন উদ্দেশ্য। অথচ এরাই দেশে-বিদেশে মর্যাদাবান হিসেবে খাতির যত্ন আদায় করে নিচ্ছে। দুনিয়ার সেরা একজন শিল্পীর বদলে একজন ঘুষখোর প্রধানমন্ত্রীকে সরকারি অতিথিভবন ছেড়ে দেয়া হবে, বর্তমান যুগে এ আর আশ্চর্য কি।

মনের সাধ মিটিয়ে পার্সোন্যাল সেক্রেটারিকে গালমন্দ করা হলো না, ইউনিফর্ম পরা একজন এয়ারপোর্ট কর্মী এগিয়ে আসছে। লোকটা ডয়েটকে বলল, 'আসুন, ওস্তাদকে আমরা সবার আগে প্লেনে তুলে দিই।'

খাতিরের কি বহর, তিক্ত হেসে ভাবল ভ্যানডেরবার্গ। একজন জাত শিল্পীর জন্যে এটুকু করেই নিজেদের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে চায় ওরা। চেহারায় রাগ আর অসন্তোষ নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

ভিয়েনায় তখন সকাল দশটা, মেঘ ছাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট উঠে সিধে হলো ভ্যানডেরবার্গের প্লেন। লণ্ডনে, প্রায় ওই একই সময়ে, পিকাডেলির অ্যামব্যাসাডর হোটেল থেকে বেরিয়ে হিথ্রো বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলো রানা।

আগের দিন লণ্ডনে পৌঁচেছে সে। হোটেলে ঢোকার পর থেকে অপেক্ষার পালা শুরু হয়। আশা, কেউ বা কিছু একটা আসবে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর নক করে একটা মেয়ে ঢুকল কামরায়। গায়ের রঙ শ্যামলা, একহারা গড়ন, সম্ভবত ভারতীয় বা পাকিস্তানী। মেয়েটার চোখ দুটো বিষণ্ন, মুখে লাজুক হাসি, কাঁধে নতুন তোয়ালে। কামরা থেকে সে বেরিয়ে যাবার পর দরজায় তালা লাগাল রানা। জানে, বাথরূমে একাধিক তোয়ালে আছে।

নতুন তোয়ালেটা বাথরূমেই পেল রানা। ভাঁজ খুলতেই ভেতর থেকে মোটা একটা ম্যানিলা এনভেলাপ বেরুল। নতুন ডকুমেণ্টগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও। জাঁ ভ্যালেরি-র নামে একটা ফ্রেঞ্চ পাসপোর্ট রয়েছে, সাথের আর সব কাগজ-পত্র থেকে জানা গেল জাঁ ভ্যালেরি একজন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক। এনভেলাপ থেকে প্লেনের টিকেট, আর লকারের চাবিও বেরোল। পাসপোর্টের ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা, বছর দশেক পর ওর চেহারা ঠিক এই রকমই হবে। সবশেষে একটুকরো কাগজে লেখা কয়েকটা সংলাপ পড়ল রানা।

সেই রাতেই অটো এমারসনের সমস্ত জিনিস-পত্র খয়েরি একটা কাগজে মুড়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। ট্যাক্সি নিয়ে ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছুল ও। চাবির গায়ে ন'র দেখে লকারটা খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। ভেতরে একটা পুরানো ক্যানভাসের সুটকেস পাওয়া গেল। লাগেজ ট্যাগে জাঁ

ভ্যালেরি-র নাম লেখা রয়েছে, নামের পাশে রয়েছে প্যারিসের একটা ঠিকানা। সুটকেসটা নিল রানা, লকারে রাখল খয়েরি প্যাকেট। বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে।

হেঁটে হোটেলে ফেরার পথে কয়েক জায়গায় থামল রানা। টেমস নদী পেরোবার সময় ব্রিজের ওপর দাঁড়িয় প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করল। ব্রিজ থেকে পার্লামেন্ট ভবন দেখা যায়, শহরের সমস্ত উজ্জ্বল আলো গায়ে মেখে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। বিগবেন ঘণ্টা দিতে শুরু করল। কালো পানিতে লকারের চাবি ফেলে দিয়ে ব্রিজ থেকে নেমে এল রানা।

আরেকবার শ্যারিং ক্রসে থামল রানা। কেমিস্টের দোকান থেকে বেরিয়ে এল হোটেলে। নিজের কামরায় ঢুকেই দরজা বন্ধ করল ও, ওর অনুপস্থিতিতে ভেতরে কেউ ঢুকেছিল কিনা ভাল করে পরীক্ষা করল। এরপর বাথরূমে ঢুকল ও, সুইস পাসপোর্ট আর অটো এমারসনের অন্যান্য কাগজ-পত্র সিঙ্কে রেখে সবগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন নিভে যেতে দুটো ট্যাপই ছেড়ে দিল, ধীরে ধীরে সমস্ত ছাই নেমে গেল ড্রেনে।

এরপর কেমিস্টের দোকান থেকে কেনা হেয়ার প্রিপারেশনস-এর মোড়ক খুলল রানা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পাসপোর্টের ছবির দিকে তাকাল।

পরদিন, অর্থাৎ আজ সকালে, সকলের অগোচরে ফরাসী সাংবাদিক জাঁ ভ্যালেরি বেরিয়ে এল অ্যামব্যাসাডর হোটেল থেকে। হিথ্রোতে পৌঁছে টি-ডাব্লিউ-এ-র ভিয়েনা থেকে আসা সকালের ফ্লাইটে চড়ে বসল সে, রওনা হয়ে গেল নিউ ইয়র্ক সিটির উদ্দেশে।

চার

কেনেডি এয়ারপোর্টের টি-ডাব্লিউ-এ টার্মিনাল, ভিড় ঠেলে নিউজস্ট্যাণ্ডের দিকে এগোল রানা। কনুই আর হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারতে হলো ওকে, কারণ তা না হলে শুধু চারদিক থেকে বেমক্কা ধাক্কাই খেতে হবে, এক পা-ও এগোনো যাবে না। নিউ ইয়র্ক রানার প্রিয় শহরগুলোর একটা হলেও, শহরটা দিনে দিনে নরকতুল্য হয়ে উঠছে। ইউরোপের লোকেরা নিউ ইয়র্কের কথা উঠলেই আজকাল বলে, অসভ্যদের বাস ওখানে। কথাটা মিথ্যে নয়। ইউরোপের যে কোন শহরে দেখা যাবে, কিছুর জন্যে অপেক্ষা করতে হলে মানুষ এক লাইনে শান্তভাবে দাঁড়ায়। কিন্তু নিউ ইয়র্কে জোর যার মুল্লুক তার। কর্কশ গলায় সবাই সারাক্ষণ অশ্লীল মন্তব্য করে চলেছে। একা রাস্তা দিয়ে হাঁটার পর্যন্ত উপায় নেই, এক দুই ডলার পর্যন্ত ছিনতাই হয়ে যাবে। এক কপি নিউ ইয়র্ক টাইমস কিনে কাঁচের সুইং ডোর ঠেলে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে বেরিয়ে এল ও। বগল থেকে নিয়ে হ্যাটটা মাথায় দিল, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

স্ট্যাণ্ডে কোন ট্যাক্সি নেই। তীরবেগে ছুটে এল একটা সুটকেস, ঝট্ করে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে মাথাটাকে বাঁচাল রানা। খুবই কম বয়স মেয়েটার, হাত খালি করে এবার প্রায় সমবয়েসী স্বামীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, দমাদম কিল মারছে।

স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়ল রানা। দৃশ্যটা পুনর্মিলনের। উল্লট আদরে অস্থির স্বামী শান্ত করার চেষ্টা করছে স্ত্রীকে, আর একদিনের জন্যেও তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। পথিকদের কাণ্ডজ্ঞানের ভারি অভাব, সবাই যেন পণ করেছে সুটকেসটাকে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করবে। অনেক কষ্টে সেটাকে ফুটপাথ থেকে উদ্ধার করে আনল রানা, ফিরিয়ে দিতে গিয়ে শান্ত স্বামী-স্ত্রীর ঘেরাও-এর মধ্যে পড়ে গেল। ছেলেটা করমর্দন করল ওর সাথে, ব্যথায় আরেকটু হলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা। মেয়েটা পায়ের ডগার ওপর দাঁড়িয়ে চুমো খেলো—যেন হুল বিঁধল কপালে।

এই অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর কোন শহরে দেখেনি রানা। নিউ ইয়র্কের লোকেরা স্থির থাকতে জানে না—প্রেম, ঝগড়া, মিছিল, নাচ-গান, জগিং, মারপিট, ধর্মঘট—কিছু না কিছু একটা করছেই। এবং যাই করুক, কিছুই ওরা শান্তভাবে করতে জানে না।

মধ্যবয়স্ক এক দম্পতিকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা, একটা ট্যাক্সি আসছে। ট্যাক্সি থামতে না থামতে দরজার হাতল ধরে ফেলল ও।

সামনের খালি সীটের ওপর ঝুঁকে জানালা দিয়ে মুখ বের করল ড্রাইভার। 'কোথায় যাবে, দোস্ত?'

ঢাকার কোন স্যুট পরা লোককে ড্রাইভার যদি দোস্ত বলে, তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে, ভাবল রানা। 'ম্যান হাটন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজা খুলে দিল ড্রাইভার। আজকাল ট্যাক্সিতে চড়ার আগে ড্রাইভারের অনুমতি নিতে হয়, শুনেছে রানা। অথচ আইন আছে কোন লোক শহরের মধ্যে যে-কোন জায়গায় যেতে চাইলে ড্রাইভার তাকে নিয়ে যেতে বাধ্য।

'রিজন্সিতে,' ট্যাক্সি আবার চলতে শুরু করলে বলল রানা। প্রাইভেট কোম্পানির ট্যাক্সি, ড্রাইভার আর আরোহীর মাঝখানে

বুলেট-প্রুফ পার্টিশন নেই। থাকলে মস্ত একটা সুবিধে, ড্রাইভারের বকবকানি শুনতে হয় না।

ভাঁজ খুলেই নিউ ইয়র্ক টাইমসে মন দিল রানা। আগেই দেখে নিয়েছে, ভ্যান উইক এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ছুটছে ট্যাক্সি। প্রথম পাতার হেডলাইনগুলোয় চোখ বুলিয়ে ভেতরের পাতা খুলল। হঠাৎ, অনেকটা যেন লাফ দিয়ে চোখে উঠে এল ছোট্ট খবরটা। নামটাই দায়ী, তা না হলে ভাঁজের ভেতর অর্ধেক লুকানো হেডিং দেখতেই পেত না। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল রানা।

'এথেন্স (এ-পি)—রড ডিকসন, পঁয়ত্রিশ, এখানকার মার্কিন দূতাবাসে অ্যাসিস্ট্যান্ট টু ফার্স্ট সেক্রেটারি, গতকাল বিকেলে গ্রীসে অ্যাটিক উপকূল থেকে খানিক দূরে সারডোনিক গালফে ডুবে মারা গেছেন। খবরে জানা যায়, একটা ইয়ট থেকে সাগরে পড়ে যান তিনি।

ডিকসনের কয়েকজন বন্ধু, যারা ইয়টের মালিক, জানিয়েছেন, ডিকসন ভাল সাঁতার জানতেন না। কয়েক ঘণ্টা পর তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়, এখান থেকে বিশ মাইল দক্ষিণে লাগোনিসির কাছে।'

ওর সাথে দেখা হলো, আর তার পরদিনই মারা গেল লোকটা! ডাবল রেড অ্যালার্টের সাথে এর কি কোন সম্পর্ক আছে? ব্রাসেলসের অশীতিপর বৃদ্ধের কথা মনে পড়ল রানার। সে-ও কি মারা গেছে? ভারতীয় মেয়েটা? কালোকেশী?

'চিন্তার বিষয়!' কাগজটা ভাঁজ করে সীটের এক ধারে ছুঁড়ে দিল ও।

'তারমানে?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'কিছু না।' নিজেরই খেয়াল নেই, রানা তাকিয়ে আছে ড্যাশবোর্ডে লটকানো প্লাস্টিক মোড়া ড্রাইভারের লাইসেন্সের

দিকে। উত্তরটা শুনে আপন মনে কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার। রানার মাথার ভেতর নানা রকম চিন্তা। হঠাৎ করেই একটা ঝাঁকি খেলো ও। এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল, কিন্তু দেখছিল না, এখন দেখতে পাচ্ছে। নামঃ ভ্যান বেক। ফটোঃ গোলমুখো ষাট বছরের এক বুড়ো। ঝট্ করে ড্রাইভারের দিকে ফিরল রানা। বুড়োর চেয়ে অন্তত পঁচিশ বছর ছোট হবে লোকটা–চওড়া কাঁধ, শক্ত ঘাড়, কালোর বদলে ধূসর চুল, বাদামীর জায়গায় ম্লান নীল চোখ।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। আরে, লোকটা ওকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়!

ড্রাইভারের দিকে ফিরল রানা। দুটো হাতই স্টিয়ারিং হুইলে। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ, রানার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। চোখাচোখি হতে লোকটা বলল, 'হাতে সময় কি রকম?'

'নেই।' মুখস্থ করা সংলাপ আওড়াল রানা।

'সেজন্যেই আপনার কোন জায়গায় যাচ্ছি না।'

'জানি,' বলল রানা। গলার সুর শুনেই বোঝা যায়, লোকটা জার্মান। 'বাপজানকে কোথায় রেখে এলে? ভ্যান বেককে?'

'শাবাশ!' লোকটা হাসল। 'লাইসেন্সটা পাল্টাতে ভুলে গেছি। দুঃখিত।'

কিন্তু রানা পাল্টা হাসল না। বলল, 'দুঃখিত হবার কিছু নেই।' কিন্তু লোকটা যে এ-ধরনের ভুল করে মনে সেটা গেঁথে রাখল।

'ভাল কথা, আমি ডানিয়েল।' রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়ে পিছন দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'ডাবল রেড অ্যালার্টের শেষ মাথা বলতে পারেন আমাকে। প্রস্তাব পেয়েছেন, কিন্তু কাজটা কি এখনও আপনাকে বলা হয়নি। আমার কাছ থেকে শুনবেন।'

মৃদু ঝাঁকি দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল রানা। অপেক্ষা করছে,

ডানিয়েল একাই কথা বলুক। কয়েক মুহূর্ত গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকল লোকটা। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, সরু হয়ে গেছে রাস্তা। যানজট থেকে বেরিয়ে এসে গ্যাস পেডালে জোরে চাপ দিল ডানিয়েল। আশি মাইল স্পীডে ছুটছে একটা ফোক্সওয়াগেন আর একটা লিমুসিন, গাড়ি দুটোর মাঝখানে থাকল ওরা। লিমুসিনটাকে পাশ কাটাবার সময় ব্যাক সীটে বসা আরোহীকে দেখতে পেল রানা। সাদা চুল, নির্লিপ্ত চেহারা। চিনতে পেরে গম্ভীর হয়ে গেল ও। বিখ্যাত বেহালা বাদক, হফ ভ্যানডেরবার্গ।

দু'বছর আগের কথা মনে পড়ে গেছে রানার। পৃথিবীতে এমন লোক অনেক আছে যাদের খুন করলে অন্যায় হবে না, হফ ভ্যানডেরবার্গ সেরকম একজন লোক। অ্যানি দিয়েত্রিচ-এর সাথে ব্রাজিলে দেখা হয় রানার, তার স্বীকারোক্তি আদায় করে ও।

কাগজগুলো কোথায় আছে স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ে গেল—নিউ ইয়র্কেই! সিটি ব্যাংকের একটা ভল্টে...।

চিন্তায় বাধা পড়ল।

'আমরা আপনাকে মালী হিসেবে দেখতে চাই,' সকৌতুকে বলল ডানিয়েল, নাটুকে হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। 'একটা গোলাপ কুঁড়ি তুলে আনতে হবে। ভাল কথা, অ্যাসাইনমেণ্টের নামও তাই—গোলাপ কুঁড়ি।'

শুধু পিছনটা নয়, ভিউ মিররে ডানিয়েলের সামনেটাও দেখতে পাচ্ছে রানা। হাসিখুশি, শান্ত প্রকৃতির লোক। শুধু ম্লান নীল চোখ দুটো ফাঁস করে দেয়, এ লোক সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। হাসিখুশি, কিন্তু হাসিটুকু কখনোই চোখ স্পর্শ করে না। লোকটার ভেতরটা যেন পরিষ্কার দেখতে পেল রানা—প্রতিটি স্নায়ুর শেষ মাথা স্টেনলেস স্টীলের তৈরি মেরুদণ্ডের সাথে সংযুক্ত।

ট্রাইবরো ব্রিজ পেরোচ্ছে ওরা, সামনে আর দু'পাশে মনোহর

প্রাকৃতিক দৃশ্য। দেখেও দেখল না রানা। মন দিয়ে ডানিয়েলের কথা শুনছে।

'টিউলিপ কনওয়ের সাঙ্কেতিক নাম গোলাপ কুঁড়ি। টিউলিপ কনওয়েকে আপনি জানেন।'

রীতিমত একটা ধাক্কা খেলো রানা। টিউলিপ কনওয়ে–ফর গডস সেক! 'বলে যান!' রুক্ষকণ্ঠে তাগাদা দিল ও। সারা পৃথিবীতে না হলেও, আমেরিকার ঘরে ঘরে পরিচিত নামটা। নিষ্পাপ একটা চেহারা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। বড় বড় খয়েরি চোখ, ফোলা মুখে পবিত্র হাসি। দেখে কার না আদর করতে ইচ্ছে করে!

মার্কিন প্রেসিডেন্টের একমাত্র সন্তান।

রানা জানে, তবু মুখ ফুটে উচ্চারণ করল ডানিয়েল, 'রিচার্ড কনওয়ের মেয়ে।'

দ্রুত হাতে একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'কাজটা কি? প্রোটেকশন?' মাথা নাড়ল ও। 'সেজন্যে আলাদা লোক আছে, আমাকে দিয়ে হবে না।'

'আরে না!' আবার হাসল ডানিয়েল, এবারও চোখ স্পর্শ করল না তার হাসি। 'তবে যে-ধরনের কাজ আপনি করেন, এটা সে-ধরনের নয়।' রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে রানার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করল সে। 'আপনাকে তো বলাই হয়েছে, জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজটা দিচ্ছি আমরা আপনাকে।'

ধৈর্য হারিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, মাথার ওপর একটা হাত তুলে চুপ করিয়ে দিল ডানিয়েল। ম্যানহাটন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি, টোল বুথে পয়সা ছুঁড়ে দিল সে। তারপর জানালার কাঁচ তুলে দিয়ে ইস্ট রিভার সাইড-এর দিকে গাড়ি ছাড়ল।

এখন আর হাসছে না ডানিয়েল। 'টিউলিপ কে, এটুকু জানাই

যথেষ্ট নয়। মেয়েটা সম্পর্কে সব কিছু জানতে হবে আপনাকে।'

নিঃশব্দে সিগারেটে টান দিল রানা। অধৈর্য হয়ে লাভ নেই। লোকটার স্বভাবই এই, একটু একটু করে সুতো ছাড়া। অনুভব করল, ঘামতে শুরু করেছে হাতের তালু। কাজটা কি জানার আগেই রোমাঞ্চ অনুভব করছে ও। ক্ষীণ একটু হাসল, দেখা যাক কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে হয়। 'কেন?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল ও। 'টিউলিপ সম্পর্কে সব কিছু জানার আমার কি দরকার?'

'আমরা চাই, আপনি ওকে কিডন্যাপ করবেন,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ডানিয়েল। 'হ্যাঁ, প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করার দরকার পড়েছে।'

পাঁচ

রিভারসাইড ড্রাইভ-এর একটা অ্যাপার্টমেন্টে রানাকে তুলে দিয়ে গেল ডানিয়েল। প্রচুর জায়গা আর রুচিসম্মত ফার্নিচার রয়েছে, চেয়ারগুলোয় বসে বেশ আরাম পাওয়া যায়। সি.আই.এ-র এটা একটা নিরাপদ আস্তানা, আন্দাজ করল রানা, ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যে আদর্শ জায়গা। রানার ইচ্ছে ছিল রিজেন্সিতে উঠবে, তবে হোটেলে ওঠার চেয়ে এ-ই বরং ভাল হয়েছে। এখানে প্রাইভেসি-র কোন অভাব নেই।

কিচেনটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, রান্নাবান্নার আয়োজনে কোন খুঁত নেই। খুদে একটা বার-ও রয়েছে, দিন সাতেক মাতাল থাকার জন্যে যথেষ্ট বোতল দেখল রানা। জিনিস-পত্র বেডরূমে রেখেছে ও,

এখনও কাপড় ছাড়েনি। ছোট্ট একটা গ্লাসে নিয়ে এক ঢোক হুইস্কি ঢালল গলায়, এই সময় আওয়াজটা কানে এল। কার্পেটের নিচে মৃদু ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল কাঠের পাটাতন।

পেশীতে টান পড়ল, কোমরের কাছে রিভলভারে পৌঁছে গেল একটা হাত। কিন্তু ঘুরল না রানা। স্থির দাঁড়িয়ে বার-এর ওপর লটকানো অয়েলপেইন্টিং দেখছে। তারপরই ঢিল পড়ল পেশীতে, বোতল থেকে আরেকটু হুইস্কি ঢালল গ্লাসে। 'আগের সেই নিঃশব্দ বিড়ালের পা আর নেই আপনার,' পিছন দিকে না তাকিয়েই বলল ও।

ওর পিছনে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'কি করে বুঝলেন আমি?'

'সেই দৃষ্টিও নেই,' বলল রানা। ইঙ্গিতে তৈলচিত্রটা দেখাল। কাঁচের গায়ে দু'জনের প্রতিবি' পড়েছে। এবার ঘুরল রানা। রঙ-চটা জিন্স পরে আছে লোকটা, নীল ক্যাপ, মুখে একদিনের না-কামানো দাড়ি। হাতের গ্লাসটা একটু উঁচু করল রানা। 'চলবে, কর্নেল?'

'প্লীজ, মেজর!'

লিভিং রূমে বসল ওরা, জানালার বাইরে বৃষ্টি ভেজা বিষণ্ন দিন। সোফায় বসার আগে সবগুলো জানালার পর্দা টেনে দিল কর্নেল উইলিয়াম অবসন। ল্যাম্প থেকে কোমল আলো বেরুল।

মুখে হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করছে কর্নেল। রানা নির্লিপ্ত। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে অফার করল কর্নেল, মাথা নাড়ল রানা। হাতের গ্লাসটা মাঝখানের নিচু তেপয়ে রাখল ও। 'কেন?'

মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল অবসনের। 'আই বেগ ইওর পার্ডন?'

'আপনি আমাকে দিয়ে প্রেসিডেন্ট কনওয়ের মেয়েকে কিডন্যাপ করাতে চান,' বলল রানা, 'কেন?'

‘জানতাম প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে পারেন।’ তেপয় থেকে নিজের গ্লাসটা তুলল অবসন, কিন্তু হুইস্কির স্বাদ নিল না। ‘সব কথা আপনাকে বলা সম্ভব নয়। সে ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয়নি।’

‘ক্ষমতা নেই, নাকি আমার ওপর বিশ্বাস নেই?’

‘না, প্লীজ, ছি-ছি!’ যেন খুবই লজ্জা পেয়েছে অবসন। ‘বিশ্বাস না থাকলে এত থাকতে আপনাকে কেন কাজটা দেব, বলুন?’

‘তাহলে? আমাকে বলতে অসুবিধে কি?’

‘ব্যাপারটা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত,’ বলল অবসন। ‘ফাঁস হয়ে গেলে আমেরিকার সর্বনাশ ঘটে যাবে। আপনাকে আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, আমরা একটা বিষাক্ত কাঁটা তোলার প্ল্যান করেছি।’

‘আমার সময়ের দাম আছে,’ বিরক্ত হলো রানা। ‘যোগাযোগ করার পর থেকে আপনারা শুধু হেঁয়ালি করে চলেছেন। আর কেউ না জানুক, আপনি অন্তত জানেন, আমি এতটা বোকা নই যে কিছু না জেনে অন্ধকারে ঝাঁপ দেব। সব কথা যদি বলা সম্ভব না হয়, আর কারও সাথে যোগাযোগ করেননি কেন?’

সত্যি কথাটাই বলল অবসন, ‘আর কাউকে এই কাজের উপযুক্ত বলে মনে হয়নি, তাই। শুধু গবেষকরাই নয়, কমপিউটরও আপনার নাম সাজেস্ট করেছে। পারলে আপনিই পারবেন।’ রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলল সে। ‘সব জানলে আপনার ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে। তাছাড়া, আমাকে বিশ্বাস করুন, কাজটা করার জন্যে সব কথা জানার দরকারও নেই।’

এককথায় জানিয়ে দিল রানা, এ-সব কথায় চিড়ে ভিজবে না, ‘আমি আপনার সাথে একমত নই।’

অবসনের চেহারা কঠিন হয়ে উঠল। ‘কাজটা কি আপনি জেনে ফেলেছেন, কাজেই…’

'ভয় দেখিয়ে কোন লাভ হবে না,' অবসনকে বাধা দিল রানা।

হাতের গ্লাসটা ঠকাস করে তেপয়ে নামিয়ে রেখে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল অবসন। 'আলোচনাটা এভাবে আপনি ভেঙে দিতে পারেন না, মি. রানা।'

কথা না বলে রানা শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

'আমার ক্ষমতা সম্পর্কে আপনি জানেন, মি. রানা,' রাগের সাথে বলল কর্নেল। 'আমি সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর। আমার কথা অনেকেই শুনবেন, তার মধ্যে প্রেসিডেন্টও একজন। আমি রানা এজেন্সির সমস্ত লাইসেন্স বাতিল করে দিতে পারি।'

রানার মধ্যে কোন বিকার দেখা গেল না। 'কি অভিযোগে?'

'রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য জানার অপচেষ্টা!'

'শুধু আপনার একার নয়, কর্নেল,' বলল রানা, 'প্রেসিডেন্টের আরও বন্ধু-বান্ধব আছেন, তাঁদের কথাও তিনি শোনেন। অভিযোগটা যে মিথ্যে সেটা তাঁর কানে তুলতে পারব আমি।'

অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল অবসন। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল সে, শুরুটা ভুলভাবে করা হয়েছে। জেদ ধরে রানার সাথে পারা সম্ভব নয়। প্রথমেই তার নরম সুরে কথা বলা উচিত ছিল। মিথ্যে ভয় দেখিয়ে ওকে পথে আনা সম্ভব নয়। তবে, রানা পাল্টা যে হুমকিটা দিল, তাতে ভয়ের কিছু নেই। রানা বা ওর বস্ মেজর জেনারেল রাহাত খান যাতে প্রেসিডেন্টের নাগাল না পায় তার ব্যবস্থা করা আছে। যাদের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের কাছে ধর্না দেবে ওরা, তাদের কাছে পৌঁছুতে চেষ্টা করলে একের পর এক বাধা আসবে। পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে কটমট করে তাকাল সে। বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, এই কাজের মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, আপনাকে রাজি করানোর জন্যে সেটাই যথেষ্ট।'

'কেউ যদি বলে, তোমাকে চ্যালেঞ্জ করা হলো, দেখি তো নিজের পায়ে কুড় ল মারতে পারো কিনা–চ্যালেঞ্জটা আপনি গ্রহণ করবেন?'

'কিন্তু আপনাকে কেউ নিজের পায়ে...'

বাধা দিল রানা, 'বুঝব কিভাবে?'

আবার পায়চারি শুরু করল অবসন। তারপর আবার রানার সামনে থামল। 'ফি-র অঙ্ক বাড়িয়ে দিন, যত খুশি টাকা নিন–কিন্তু ফর গডস সেক সব কথা জানতে চাইবেন না, প্লীজ!'

উত্তরে হাতঘড়ি দেখল রানা।

সামনের সোফায় ধপাস করে বসে পড়ল অবসন। এরই মধ্যে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে চেহারা।

ঝাড়া এক মিনিট কেটে গেল। চোখ বুজে ধ্যানে বসেছে অবসন।

রানা বলল, 'আমি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারি না।'

'আমরা একটা সিকিউরিটি লিক আবিষ্কার করেছি,' হঠাৎ শুরু করল অবসন। 'কেউ একজন ক্লাসিফায়েড ডাটা পাচার করছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। সি.আই.এ-র লোক সে, হাই অফিশিয়ালদের একজন।' রানার দিকে সরাসরি তাকাল সে। 'খুবই হাই অফিশিয়ালদের একজন। পাচার হওয়া তথ্যের ধরন দেখে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, কিন্তু কোন মন্তব্য বা প্রশ্ন করল না। এ-ধরনের ঘটনা কিছুদিন পর পর ঘটে। আর ঘটে বলেই সি.আই.এ. বিশেষ ধরনের কিছু এজেন্ট পোষে যাদের কাজই হলো ঘরের শত্রু বিভীষণদের খুঁজে বের করা। শুধু সি.আই.এ-তে নয়, প্রায় সব ইন্টেলিজেন্সেই এ-ধরনের এজেন্ট থাকে।

উঠে গিয়ে নিজের গ্লাসটা আবার ভরে নিল অবসন। এরপর

আর বসল না, ঘরের মাঝখানে হাঁটাহাটি করতে লাগল। 'প্রথম দিকে,' আবার মুখ খুলল সে, 'চারজনকে সন্দেহ করি আমরা। প্রত্যেককে আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয়। সবাই তারা উতরে যায়। মাথায় যেন বাজ পড়ে আমাদের। তাহলে কে? পঞ্চম একজন লোককে সন্দেহের তালিকায় আনতে হয়—সে এমন একজন, তার পদ মর্যাদার জন্যে তাকে আমরা প্রথমেই বাদ দিয়ে রেখেছিলাম। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য! তার মত লোক ডাবল এজেন্ট...কেন, কেন!' আঙুল দিয়ে মাথার চুল খামচে ধরল সে। 'তার ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। যে-কোন মুহূর্তে, ইচ্ছে করলেই, ওভাল অফিসে ঢুকতে পারে। প্রেসিডেন্টের পরেই তার স্থান...'

পাথর হয়ে বসে আছে রানা। শুধু চোখ দুটো অনুসরণ করছে অবসনকে। চেহারায় খানিকটা কৌতুক, খানিকটা অবিশ্বাস। 'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

ধীর ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল অবসন।

রানার চেহারা থেকে কৌতুকের ভাব অদৃশ্য হয়ে গেল। 'জেফ রিকার্ড?'

'জেফ রিকার্ড,' ফিসফিস করে বলল অবসন, প্রচণ্ড রাগে গ্লাস ধরা হাতটা কাঁপছে। 'জেফ রিকার্ড, সি.আই.এ-র ডিরেক্টর।'

সোফায় হেলান দিয়ে বড় করে একটা শ্বাস টানল রানা। চমকটা হজম করতে সময় লাগছে। অবিশ্বাস্য বটে, কিন্তু আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে, অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ডাবল রেড অ্যালার্টের কারণটা বোঝা গেল। বোঝা গেল কেন অবসন পাগলপারা হয়ে আছে। ওরা সবাই যার অধীনে কাজ করে, সি.আই.এ-র চীফ। এটুকুই যথেষ্ট খারাপ। কিন্তু জেফ রিকার্ড শুধু সি.আই.এ-র চীফ নয়, আরও অনেক কিছু। গত নির্বাচনে প্রেসিডেন্টের প্রধান মুখপাত্র ছিল সে। চীফ পলিসি

অ্যাডভাইজার।

আরও বেশি। প্রেসিডেন্টের সচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু লোকটা। প্রেসিডেন্ট তার মত আর কাউকে বিশ্বাস করেন না।

'বিপদ,' বলল রানা।

'বিপদ? বলুন, ডিনামাইট!' গ্লাসটা ঘন ঘন নাড়ল অবসন, ভেতরে লালচে হুইস্কি ঘুরতে লাগল। তার চেহারা রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে লাল হয়ে আছে। জানালার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, শব্দটাকে চাপা দিল গ্লাসের গায়ে টুকরো বরফের ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ। এক চুমুকে হুইস্কিটুকু গিলে ফেলল সে। আবার যখন রানার দিকে তাকাল, প্রায় শান্ত হয়ে গেছে চেহারা। ভাবাবেগের লাগাম টেনে ধরেছে। 'বলাই বাহুল্য প্রেসিডেন্ট নিরেট প্রমাণ চাইবেন। আমি বললেই তিনি বিশ্বাস করবেন না। সে-জন্যেই তাঁর মেয়ের কথা উঠছে।'

যোগাযোগটা কোথায়, রানা আন্দাজ করতে পারল। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এরকম একটা টোপ দিয়ে ফাঁদ পাতা হবে।

'হ্যাঁ,' বলল অবসন, যেন রানা কি ভাবছে বুঝতে পেরেছে, 'কিডন্যাপিংটা হবে জেফ রিকার্ডের পরীক্ষা। প্রেসিডেন্টের মেয়ে টিউলিপ শত্রুদের হাতে। যেভাবে হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে রিকার্ডের।' অবসনের চোখে ক্ষীণ হাসি ফুটল। 'একের পর এক সূত্র পাবে সে। আমরাই দেব, নিজেদের তৈরি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, সবগুলো সূত্র ভুয়া, কোথাও পৌঁছুনো যায় না। কোন কোন সূত্র হবে গোলমেলে, একটার সাথে আরেকটা মিলবে না। আবার কোনটা হবে ধ্বংসাত্মক। মরিয়া হয়ে উঠবে রিকার্ড, কিন্তু এগোবার কোন পথ পাবে না। তাকে আমরা অসহায় অবস্থায় ফেলব। কোণঠাসা হয়ে পড়বে সে। এ-সবই একটি মাত্র কারণে করা হবে...।'

'সে যাতে অপর পক্ষের সাথে যোগাযোগ করে।' ধীরে ধীরে

ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কৌশলটা মন্দ নয়। সেন্ট পার্সেন্ট সম্ভাবনা, ফাঁদে পা দেবে রিকার্ড। কিন্তু বিপজ্জনক। সত্যি কথা বলতে কি, এরচেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না।'

'এটাই একমাত্র কৌশল,' জোর দিয়ে বলল অবসন। 'ব্যাপারটা এমন কিছু হওয়া চাই যার সাথে প্রেসিডেন্ট সরাসরি এবং ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। নিজের মেয়ে নিখোঁজ, কাজেই তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না, কাজেই তাকে উদ্ধার করা যার দায়িত্ব তার ওপর তিনি নির্ভর করবেনই। হোয়াইট হাউসের স্টাফরা প্রতি ঘণ্টায় রিপোর্ট দেবে, কোনটাতেই পরিষ্কার কিছু থাকবে না। জানা কথা, ওগুলো তিনি মানবেন না। জেফ রিকার্ডের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য ও রিপোর্ট চাইবেন তিনি।'

'এবং কোন অজুহাতও তিনি শুনবেন না।'

'না।'

'ভুল করারও কোন অবকাশ নেই।'

'নেই। পরিপূর্ণ সাফল্য ছাড়া কিছুই তিনি মানবেন না। জেফ রিকার্ডের এ-সব কথা জানা থাকবে। সূত্রগুলো যখন ভুয়া প্রমাণিত হবে, প্রেসিডেন্টের কাছে ফিরে গিয়ে এ-কথা বলতে পারবে না যে কপাল খারাপ তাই কাজটায় ব্যর্থ হলাম, এর পরের বার আরও ভাল করার চেষ্টা করব। নো, নেভার,–এই একটা কাজে ব্যর্থ হওয়া চলবে না তার। জীবনে যা কিছু মূল্যবান মনে করে সে, সব হারাবার আশঙ্কা দেখা দেবে। তার চাকরি। প্রেসিডেন্টের সাথে তার বন্ধুত্ব। তার ক্ষমতা।'

'পামেলা কনওয়েরের সাথে তার সম্পর্কের কথা নাহয় বাদই দেয়া গেল।'

'হ্যাঁ, ফার্স্ট লেডির সাথে তার যে মধুর সম্পর্ক রয়েছে, ব্যর্থ হলে সেটাও তাকে হারাতে হবে। মোট কথা, সূত্রগুলোয় কোন

কাজ না হলে,–কাজ যাতে না হয় সেদিকটা আমরা দেখব–আর মাত্র একটা পথ খোলা থাকবে তার সামনে। লৌহ যবনিকার অন্তরালে বন্ধুদের শরণাপন্ন হওয়া। ওদের সাহায্য তার চাইতেই হবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। চমৎকার প্ল্যান। প্রেসিডেন্ট সরাসরি জড়িত, কাজেই সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে ব্যাপারটাকে।

কিন্তু জেফ রিকার্ডের সমস্যা আর রানার সমস্যা এক নয়।

রানাকে বলা হচ্ছে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করো। প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। অসম্ভব এই জন্যে যে কাজটায় কোন খুঁত থাকা চলবে না। খুঁত থাকলেই জেফ রিকার্ড টের পেয়ে যাবে, টিউলিপকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা তার জন্যে একটা ফাঁদ। তা যদি বুঝে ফেলে, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্টের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে সে, টিউলিপকে কিডন্যাপ করতে সাহায্য করেছে সি.আই.এ-রই কিছু অফিসার। কিডন্যাপার এবং সহায়তাকারীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেবেন প্রেসিডেন্ট। কিংবা রিকার্ড হয়তো পালিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যাবে। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে পালাতে হয় নিশ্চই তা সে জানে।

তারমানে, বাইরের তেমন কোন সাহায্য ছাড়াই কাজটা রানাকে একা করতে হবে। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর, অদ্ভুত একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করল। এত বড় ঝুঁকি আগে কখনও নেয়নি ও। উঠে গিয়ে গ্লাসে আরও খানিকটা হুইস্কি নিল। মোটিভ বাদ দিয়ে অপারেশন নিয়ে ভাবছে। 'কেন' গুরুত্ব হারাল, গুরুত্ব পেল 'কিভাবে'। কে কার পক্ষ নিয়ে কাজ করছে সেটা জানা দরকার, কিন্তু এই মুহূর্তে জরুরী মনে হলো না।

ঠেকায় পড়ে সাহায্য চাইছে সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর, মোটা টাকা আয় হবে রানা এজেন্সির। আর অনুমতি তো বস্

আগেই দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কাজটা রানার করার ইচ্ছে অন্য কারণে। চ্যালেঞ্জটা নিতে চায় ও। টিউলিপকে কিডন্যাপ করা অসম্ভব, তাই করবে। রহস্যের ভেতর রহস্য থাকতে পারে, সেটাও একটা কারণ। কিন্তু তা নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে।

'যদি করি,' অবসনকে বলল ও, 'প্ল্যানটা আমার নিজের হবে।'

'স্বভাবতই,' সাথে সাথে জবাব দিল অবসন। 'আমি পারলে আপনাকে দরকার হত না।' রানার সামনে সোফায় বসল সে।

'মেয়েটার কোন ক্ষতি হওয়া চলবে না।'

'বলাই বাহুল্য। ক্ষতি তো দূরের কথা, তাকে সত্যিকার কোন ঝুঁকির মধ্যেই রাখা চলবে না। শুধু টিউলিপ কেন—পরিবারের অন্যান্য সদস্য, চাকরবাকর, স্টাফ, সিক্রেট সার্ভিস, কারও কোন ক্ষতি করা যাবে না। কেউ যেন আহত না হয়।'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন, প্রেসিডেন্টকে যেন খুন না করে ফেলি, এই তো?'

গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল অবসন। 'নিজের ভাল চাইলে না করাই উচিত হবে।'

কিন্তু শিরিন ওর হাত দেখে কি যেন বলেছিল? স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। মনে পড়তেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা—দুই সুপার পাওয়ারের যে কোন একটার সরকার প্রধান আপনার হাতে খুন হবেন।

রুশ সরকার-প্রধান, নাকি মার্কিন সরকার-প্রধান?

'কিডন্যাপ করলেন, তারপর? তারপর কি হবে?'

'বলুন।'

'হোয়াইট হাউস থেকে বের করার পর টিউলিপকে আপনি দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাবেন,' বলল কর্নেল।

চিন্তিত হয়ে উঠল রানা। চোখের সামনে হোয়াইট হাউসের

ছবি ভেসে উঠল। বাইরে থেকে দেখা যায় না, ভেতরে কাঁটাতারের বেড়া আছে—ইলেকট্রিফায়েড। ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেমের কিছু কিছু রহস্য জানে ও, বেশিরভাগই জানে না। সিক্রেট এজেন্ট আর স্পেশাল পুলিস গিজ গিজ করছে চারদিকে। এ-সব বাধা টপকে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে চুরি করে আনতে হবে। এখানেই শেষ নয়। এরপর আবার সুরক্ষিত মার্কিন বর্ডার পেরোতে হবে। ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। 'খুব সহজ করে দেবেন না,' হালকা সুরে বলল ও। 'আমার একঘেয়ে লাগতে পারে।'

ঠোঁট টিপে হাসল অবসন। 'দেখতে পাচ্ছি চ্যালেঞ্জটা আপনি উপভোগ করছেন!'

রানা গম্ভীর হলো। 'কাজটা কঠিন।'

'জানি। এত কঠিন যে আপনার সাহায্য চাইতে হলো। একটা কথা...,' বলে চুপ করে গেল অবসন।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। একটা চুরুট ধরাল অবসন, তারপর আবার বলল, 'গোটা ব্যাপারটাকে আন্তর্জাতিক বলে মনে হতে হবে। তবেই জেফ রিকার্ড বিশ্বাস করবে যে রাশিয়ানরা সাহায্য করতে পারবে তাকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'টিউলিপকে...,'

ভুলটা শুধরে দিল রানা, 'গোলাপ কুঁড়ি।'

'ও, ইয়েস, সরি! ওকে আপনি যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারেন, মানে গ্রীসের যে কোন জায়গায়।'

'গ্রীসে কেন?'

'কারণ আপনার যদি সাহায্য দরকার হয়, ওখানে আমার বিশ্বস্ত লোক আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, গোলাপ কুঁড়ি গ্রীসে পৌঁছুল।

তারপর?'

'ওখানে আপনি আমার সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন,' বলল অবসন। ঠোঁটের কোণ থেকে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল সে, সরাসরি তাকিয়ে আছে রানার চোখে। 'তারপর আমাদের দেখা হবে। আপনার কাছ থেকে গোলাপ কুঁড়ি ডেলিভারি নেব আমি। তার আগে পর্যন্ত, কিছুই আপনি করবেন না। স্রেফ সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখবেন ওকে। কমপক্ষে দু'হপ্তা লুকিয়ে রাখতে হবে—বেশিও হতে পারে, নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর।'

দু'হপ্তা! ডানিয়েল ঠিকই বলেছিল, গোলাপ কুঁড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানা দরকার ওর।

গ্রীসের কোথাও ওকে নিয়ে যেতে হবে, রানা জানে। জানে না শুধু প্রেসিডেন্টের মেয়েকে নিয়ে কিভাবে ওখানে পৌঁছুনো যায়। 'ভুয়া সূত্র সম্পর্কে বলুন এবার।'

'ওসব ডানিয়েল সামলাবে। ও এখানে এলেই আপনার কি কি লাগবে আলোচনা করব আমরা। ভাল কথা, ও-ই আপনার সাথে আমার যোগাযোগ। আজ আমি এখান থেকে চলে যাবার পর, গোলাপ কুঁড়িকে ঘরে ফিরিয়ে আনার সময় না হওয়া পর্যন্ত চাই না আপনার সাথে আমার আবার দেখা হোক।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। গ্লাসটা ভরার জন্যে আবার উঠল।

'ও, হ্যাঁ, ভাল কথা—ভুলে যাবেন না, আপনি মারা গেছেন।'

'কেউ ভোলে?' অবসনের দিকে পিছন ফিরে বোতল থেকে হুইস্কি ঢালল রানা। বোতলের ছিপি বন্ধ করল। ফিরল অবসনের দিকে। 'শুধু দুঃখ এই যে আগে খবর পাইনি, তা না হলে মাটি দিতে অবশ্যই যেতাম।'

'গোটা ব্যাপারটা প্রায় চুপিসারে সারা হয়েছে,' বলল অবসন। 'বলতে গেলে প্রায় কেউই উপস্থিত ছিল না।'

'তাহলে বলব, আপনাদের কাজে একটা খুঁত থেকে গেছে।'

'কি রকম?'

'আমাকে কবর দেয়া হলো, অথচ সেখানে আমার বস্ উপস্থিত ছিলেন না,' বলল রানা, 'অনেকেই ব্যাপারটাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখবে।'

অবসনের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'উনি ছিলেন।'

'হোয়াট!'

'তাঁর ছদ্মবেশ নিয়ে অন্য এক লোক।'

কঠিন সুরে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওঁর অনুমতি নিয়েছেন?'

হাসল অবসন, বলল, 'অবশ্যই।' কলিং বেল বেজে উঠল। 'ডানিয়েল পৌঁছে গেছে।' সোফা ছেড়ে দরজার দিকে এগোল সে। তাকে বাধা দিল রানা, ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজেই এগোল। নিঃশব্দে দরজার পাশে দাঁড়াল রানা, পিপহোলের ঢাকনি সরিয়ে চোখ রাখল ফুটোয়। ডানিয়েলই, এখনও আগের সেই জ্যাকেটটা পরে আছে, হাতে একটা অ্যাটাচি কেস। তালা খুলে কবাট উন্মুক্ত করল রানা। কব্জায় তেল দেয়া হয়েছে, কোন শব্দ হলো না।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ডানিয়েল। 'অ্যাপার্টমেন্ট পছন্দ হয়েছে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে।

লোকটা রানার চেয়েও লম্বা, শক্তিশালী গঠন। মুখের বাঁ দিকে, চোখের নিচ থেকে জুলফি পর্যন্ত পুরানো একটা কাটা দাগ। চিন্তাটা আরেকবার খেলে গেল রানার মাথায়—আর লোক পেল না অবসন, এরকম একটা দাগী লোক দু'জনের মাঝখানে যোগাযোগ হিসেবে থাকবে? 'ভালই,' জবাব দিল ও।

খুশি হলো ডানিয়েল। 'চেষ্টা করছি আপনার সব প্রয়োজন যেন মেটে এখানে।' রানার হাতের গ্লাসটা লক্ষ করল সে। 'দুঃখের বিষয়, পাশের অ্যাপার্টমেন্টের লালচুলো সুন্দরী মেয়েটা

হপ্তা কয়েকের জন্যে চলে গেছে…'

'নিশ্চই স্বইচ্ছায় নয়।'

'না। বেচারি পায়ে আঘাত পেয়েছে। স্কিইং করছিল, আরেকজনের সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে যায়।' ডানিয়েলের চোখে উল্লাসের নগ্ন নীল আলো নাচতে লাগল। সাবধান, নিজেকে সতর্ক করল রানা, লোকটা ভয়ঙ্কর। ধূসর চুল আর ফর্সা গায়ের রঙের সাথে মুখের কাটা দাগটা মেলেনি, ওটা লালচে। চোখ ফিরিয়ে নিল রানা।

একটা চেয়ারের পাশে অ্যাটাচি কেস নামিয়ে রাখল ডানিয়েল, চেয়ারটায় বসল। অবসনের দিকে তাকাল সে। কিন্তু অবসন তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'যা যা চান সব আপনি পাবেন,' বলল অবসন। 'আক্ষরিক অর্থেই বলছি–যে-কোন জিনিস। লোকবল, ভুয়া কাগজ-পত্র, টেকনিক্যাল সার্ভিস, সমস্ত।'

'টাকা?'

'আগের কাজটায় সি.আই.এ. আপনাকে এক বিলিয়ন টাকা দিয়েছিল,' বলল অবসন। 'কারণ, মেরিলিন চার্টের দাম ছিল কয়েকশো বিলিয়ন ডলার। এই কাজটা আরও কঠিন। আমরা সফল হলে লাভ কি হবে সেটা হিসেব করা সম্ভব নয়। আমেরিকা রাহুমুক্ত হবে, কাজেই লাভ হিসেব করা কিভাবে সম্ভব! সমস্ত খরচ আমাদের, আপনার ফি ধরা হয়েছে দুই বিলিয়ন ডলার। যদি আপত্তি করেন…'

মাথাটা ঘুরে উঠল রানার। 'কত বললেন?'

'ঠিক আছে, আড়াই বিলিয়ন,' তাড়াতাড়ি বলল অবসন। 'এতেও যদি সন্তুষ্ট না হন আমাকে তাহলে প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করতে হবে… ।'

বলে কি! আড়াই বিলিয়ন ডলার? ওদের কি মাথা খারাপ

হয়েছে! মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। অঢেল টাকা দিয়ে কি কিনতে চাইছে ওরা? ওর সার্ভিস, নাকি ওর আনুগত্য? রহস্যের ভেতর রহস্য?

নিজের অজান্তেই লোভ জাগল মনে। বি.সি.আই-এর অনেকদিনের একটা অভাব পূরণ হতে পারে দুই বিলিয়ন ডলার হাতে এলে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড একটা সাবমেরিন কিনতে পারে ওরা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে।'

'হাত খরচের জন্যে আপাতত এক লাখ ডলার হলে চলবে?' জিজ্ঞেস করল অবসন, রানা আড়াই বিলিয়নে রাজি হওয়ায় ভারি খুশি সে।

'চলবে,' বলল রানা। 'পরে আরও লাগলে বলব। এক লাখ ডলার ছোটবড় নোটে মিলিয়ে দেবেন। নতুন টাকা নয়। কোন মার্ক থাকা চলবে না। পুরো টাকাটা যেন মানি বেল্টে ধরে।'

ডানিয়েলের দিকে তাকাল অবসন। ডানিয়েল মাথা ঝাঁকাল। সম্ভব।

'টাকা ছাড়াও অনেক জিনিস দরকার হবে আমার,' বলল রানা।

ঝুঁকে অ্যাটাচি কেসটা কোলের ওপর তুলল ডানিয়েল। তালা খুলে ডালা তুলল। একটা ফাইল বের করল ভেতর থেকে। 'টিউলিপ কনওয়ের ফাইল... ।'

খুক করে কাশল অবসন।

'দুঃখিত, গোলাপ কুঁড়ি,' বলল ডানিয়েল। 'সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে পর্যন্ত যা যা করে, সমস্ত কিছুর বিস্তারিত বিবরণ পাবেন এতে। তার যে-সব বন্ধু বা আত্মীয়রা হোয়াইট হাউসে বেড়াতে আসে বা আসবে, সবার নাম-ঠিকানা আছে। তার ডাক্তার আর ডেন্টিস্টও বাদ যায়নি। মাত্র চার বছর বয়স, ব্যক্তিগত অভ্যাস কি আর থাকতে পারে,

তবু কিছু কিছু ব্যাপার নোট করা আছে।' রানার দিকে সরাসরি তাকাল সে। 'সিকিউরিটি সম্পর্কে আলাদা ফাইল। পারমানেণ্ট অ্যাসাইনমেণ্টে রয়েছে ছ'জন এজেণ্ট। দরকার হলে আরও অনেকে মুহূর্তের নোটিশে হাজির হবে। ওরা ছ'জন পালা করে ডিউটি দেয়।'

ফাইলগুলো নিয়ে চোখ বুলাল রানা। 'আপনাদের ভাল সোর্স আছে দেখছি।'

'তা আছে।'

'এসব তথ্য নিখুঁত কিনা...'

'সম্পূর্ণ।'

একবার চোখ বুলিয়ে ফাইলগুলো আপাতত একপাশে সরিয়ে রাখল রানা। পরে মন দিয়ে পড়বে সব। 'আর কি দরকার বলছি। মেয়েটা আমার জন্যে কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হলো তার চারপাশে যারা রয়েছে। ওদের সবার ফাইল দরকার হবে আমার।'

'বেশ।' মাথা ঝাঁকাল অবসন।

'প্রতিদিন সিক্রেট সার্ভিস নানা রকম তথ্য পায়, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওগুলো আমাকেও জানতে হবে। আর পরিবারের প্রত্যেকের শিডিউল আগেভাগে পেতে হবে।'

ডানিয়েলের দিকে না তাকিয়েই অবসন বলল, 'পাবেন।'

'হোয়াইট হাউসে প্রচুর চিঠিপত্র আসে, যায়ও,' বলল রানা। 'সবগুলো কপি দরকার আমার।'

মাথা ঝাঁকাল অবসন। 'আর কিছু?'

'পুরানো চিঠিগুলো দরকার,' বলল রানা। 'যত পুরানো সম্ভব।'

অবাক হলো অবসন। 'কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তা জানি না। জানলে তো বলেই

দিতাম, অমুক দিনের চিঠিগুলো শুধু নিয়ে আসবেন। সব পেলে ঘাঁটতে ঘাঁটতে হয়তো এমন কিছু চোখে পড়বে, হোয়াইট হাউসে ঢোকার একটা উপায় পেয়ে যাব।'

'লম্বা অর্ডার,' চিন্তিতভাবে বলল অবসন। 'একটু ছোট করে আনা যায় না? হোয়াইট হাউসে প্রতি হপ্তায় পঁচাত্তর হাজার চিঠি আসে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রানা বলল, 'এক কাজ করুন। ভক্ত আর খ্যাপাদের চিঠি বাদ দিন। ফটো, অটোগ্রাফ, ইত্যাদি চেয়ে লেখা চিঠিগুলোও দরকার নেই। বিল, মেমো, এ-সবও বাদ।'

কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল অবসন, তারপর ডানিয়েলের দিকে ফিরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

'খবরের কাগজ,' বলল রানা। 'ওয়াশিংটনের সবগুলো দৈনিক। সেদিনেরটা সেদিনই।'

'ওটা কোন সমস্যা নয়,' বলল অবসন।

'গোলাপ কুঁড়ি কত বড় জানতে হবে আমাকে।'

অবসন শ্রাগ করল। 'বয়সের তুলনায় ছোটই বলা চলে তাকে।'

'সঠিক মাপ, ওজন ইত্যাদি জানতে হবে,' বলল রানা। 'কতটা লম্বা? ক'বছর ক'মাস ক'দিন বয়স?'

'আর কিছু?' সোফায় নড়েচড়ে বসল অবসন।

'হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস। ব্যাপারটা আমার জন্যে একান্ত দরকার।' সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। ঝুঁকি নিয়ে ভাবছে ও। জীবনের ঝুঁকি নয়, সেটা তো প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আছে। ওর এই পেশায় মৃত্যু একটা স্বাভাবিক সম্ভাবনা। মৃত্যুর চেয়ে বেশি ভয় করে রানা ব্যক্তিগত পরাধীনতাকে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মেয়েকে নিয়ে পালাবার সময় ধরা পড়ে গেলে কত

যুগ জেলে পচতে হবে কে জানে!

সত্যি বটে, খোদ সি.আই.এ. তাকে আইন ভাঙার অধিকার দিচ্ছে। সেদিক থেকে ভাবলে কোন হুমকি নেই। কিন্তু এবারের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। কোন সন্দেহ নেই, সি.আই.এ. তার সীমা লংঘন করতে যাচ্ছে। এর চেয়ে বিপজ্জনক কাজে আর কখনও রানাও হাত দেয়নি। অথচ অনুরোধটা সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ডের কাছ থেকে আসছে না। ঠিক উল্টো, গোটা ব্যাপারটাই পরিচালিত হবে তার বিরুদ্ধে।

সরাসরি অবসনের চোখে তাকাল রানা। 'এই অ্যাসাইনমেন্ট অথোরাইজ করছে কে?'

মাথা নাড়ল অবসন। 'সেটা আপনাকে আমি বলতে পারি না।'

শ্রাগ করল রানা। 'তারমানে রানা এজেন্সির সার্ভিস আপনি প্রত্যাখ্যান করছেন। শুধু আপনার একার কথায় কেন ঝুঁকি নিতে যাব আমি?'

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা। বাইরে আরও চেপে এল বৃষ্টি, ফোঁটাগুলো তেরছাভাবে পড়ছে। জানালার কাঁচে। ঘরে আর কোন আওয়াজ নেই।

অবশেষে, অবসনই প্রথম কথা বলল, 'হ্যাঁ, আপনার কথায় যুক্তি আছে। কি ধরনের প্রোটেকশন পাচ্ছেন সেটা জানার অধিকার আপনার আছে।'

'বলুন।'

'সম্ভাব্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোটেকশন–প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে।'

থ হয়ে গেল রানা। আর যাই আশা করুক ও, এটা আশা করেনি। 'প্রেসিডেন্ট? তিনি তাঁর নিজের মেয়েকে কিডন্যাপ হতে দিতে রাজি হয়েছেন? তাও, সি.আই.এ-র দ্বারা?'

'প্রেসিডেন্ট জানেন, লোকটাকে হাতেনাতে ধরতে না পারলে মহা সর্বনাশ ঘটে যাবে।'

'মাই গড!' বিস্ময়ের ঘোর রানার যেন কাটতেই চায় না। ধীরে ধীরে আবার সোফায় হেলান দিল ও। টিউলিপ কনওয়ে মহামূল্যবান একটা শিক্ষা পেতে যাচ্ছে, ভাবল ও–দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস কোরো না।

'বলুন,' জিজ্ঞেস করল অবসন, 'এবার আপনি সন্তুষ্ট? ব্যাপারটা যদি কোনভাবে কেঁচে যায়, খোদ প্রেসিডেন্ট আপনাকে প্রোটেকশন দেবেন। কি বলেন, যথেষ্ট নয় কি?'

'আমি লিখিত আশ্বাস চাই,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'পাবেন, তবে খানিক সময় দিতে হবে,' আশ্বস্ত করল অবসন। তারপর গাল ফুলিয়ে হাসল সে। 'আপনি খুব সতর্ক, মি. রানা।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যতটা ভাবছেন, ততটা নই। হলে এতক্ষণে পালিয়ে যেতাম।'

কেন যেন খুঁতখুঁতে ভাবটা থেকেই গেল রানার মনে।

ছয়

ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভয় পেলেন পামেলা কনওয়ে। আচমকা জ্বর এলে যেমন কাঁপুনি ধরে, সেরকম বার কয়েক শিউরে শিউরে উঠলেন।

রঙের কৌটায় তুলি ডুবিয়ে আবার মন দিলেন ছবি আঁকায়। মেয়ে টিউলিপের ছবি আঁকছেন তিনি, কিন্তু কোনভাবেই পরিচিত

হাসিটুকু ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে পারছেন না। আরেকবার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আসলে কোনদিনই আমি পোর্ট্রেট পেইন্টার হতে পারব না। ল্যাণ্ডস্কেপ আর স্টীল লাইফ খুবই ভাল আঁকেন। নিউ ইয়র্ক গ্যালারিতে তাঁর আঁকা ছবি বিক্রিও হয়। তবে এই শেষ, পোর্ট্রেট তিনি আর আঁকবেন না। টিউলিপের ছবি অবশ্য গ্যালারিতে পাঠানো হবে না, এটা তিনি আঁকছেন স্বামীর জন্যে, হোয়াইট হাউসের স্টাডিরূমের দেয়ালে টাঙানো হবে।

ক্যানভাসে তুলি বুলাতে বুলাতে মনের ভয়টা তাড়াবার চেষ্টা করলেন পামেলা। ভাবলেন, সব মানুষেরই কোন না কোন দুর্বলতা থাকে। আমার দুর্বলতা আমার মেয়ে। ওর যদি কিছু হয়...

হঠাৎ করে তাঁর খেয়াল হলো, আরে, এখুনি দেখছি সন্ধে হয়ে এল! হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন, পাঁচটা বেজে গেছে। স্মক খুলে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। বেডরূমের দিকে এগোলেন।

একঘণ্টা পর আবার বেরুলেন, গরম পানিতে শাওয়ার সেরে স্টেট ডিনারের জন্যে ড্রেস পরে নিয়েছেন। কুণ্ডুলী পাকানো ছোট ছোট চুলের গোছা ফ্রেমের মত ঘিরে রেখেছে মুখটাকে। খয়েরি চোখে বুদ্ধির ঝিলিক, হাঁটার ভঙ্গিতে সতেজ ভাব, নিটোল চোয়ালে দু'চারটে তিল। ফার্স্ট লেডির নাকটা খুব খাড়া, মখমলের মত গায়ের চামড়া। হাসলে, হাসিটা শুধু ঠোঁটেই থেমে থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে, চোখে; এমনকি দেহ-ভঙ্গিতেও একটা পরিবর্তন ঘটে যায়—পুলকস্পর্শে অধীর নর্তকীর মত। সন্দেহ নেই, সুখী একজন মহিলা।

হোয়াইট হাউসে দিনগুলো তাঁর সুন্দর কাটছে। স্বামীকে নিয়ে তিনি গর্বিত। বুকের ধন পরমাসুন্দরী কন্যা টিউলিপকে পেয়ে তাঁর আশা পূরণ হয়েছে। ছবি আঁকা তাঁর নেশা, হোয়াইট হাউসে

আসার পর নেশাটা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়নি। লোকে যে যাই বলুক, তিনি ভাল আছেন, এভাবে বেঁচে থাকতে পারলে তাঁর আর কিছু চাওয়ার নেই।

গুরুত্ব না দিলেও, লোকে কে কি বলে সবই তাঁর কানে আসে। ফার্স্ট লেডি নাকি মিশুক নন, তাঁকে ঠিক সামাজিক বলা চলে না। হোয়াইট হাউসের অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি নাকি উদাসীন।

মিথ্যে নয়, অভিযোগগুলো স্বীকার করেন পামেলা। চুটিয়ে গল্প করা বা আড্ডা জমানো তাঁর স্বভাব নয়। গল্প বা আড্ডা, সাধারণত দুটোরই লক্ষ্য পরনিন্দা। তাঁর দ্বারা ওটা হয় না। নিজের কাজকে তিনি ভালবাসেন, অবসর সময়ে ছবি আঁকা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চান।

আর ঘণ্টাখানেক পর সরকারি অতিথিরা আসতে শুরু করবেন, হোয়াইট হাউসের স্টেট রুমগুলোয় ভিড় জমে উঠবে। তার আগে টেবিল সাজাতে হবে, নতুন করে ফুল আর মোমবাতি সাজাতে হবে। কিন্তু এ-সব দেখার জন্যে বেতনভুক কর্মচারী আছে, ফার্স্ট লেডির চেয়ে তারাই এসব কাজে বেশি অভিজ্ঞ। তাঁর মাথা না ঘামালেও চলে।

ডিনার টেবিলে কে কোথায় বসবে, অনেক সময় তা নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। জটিলতা দূর করার জন্যে সোশিয়াল সেক্রেটারি আছে, তাঁর নাক না গলালেও চলে। ক্যালিগ্রাফার আছে, প্রয়োজন মত নতুন প্লেস-কার্ড আর প্রোগ্রাম তৈরি করবে সে। আরও আছে শেফরা, ফাইভ কোর্সের চমৎকার ডিনার তৈরি করবে তারা। কিচেনে গিয়ে কি লাভ, রান্না-বান্না সম্পর্কে কি ছাই বোঝেন তিনি?

মেন্যুতে আজ কি আছে তিনি জানেন না। জানার দরকারও নেই। অতিথি যারা আসবে তারা সবাই রিচার্ড কনওয়ের

বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত লোকজন, তারা কে কি খেতে পছন্দ করে, বা কে কোথায় বসবে, এসব প্রেসিডেন্টের জানা উচিত। হোয়াইট হাউস প্রেসিডেন্টের মাথাব্যথা, ফার্স্ট লেডির নয়। হ্যাঁ, ডিনারে থাকবেন তিনি, সঙ্গ দেবেন স্বামীকে–সময়টা তিনি উপভোগও করবেন। কিন্তু গুরুত্বহীন ঝামেলা পোহাবার মত সময় তাঁর হাতে নেই।

বিশেষ করে এই মুহূর্তে নেই।

এলিভেটরকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে হলরূমে নামলেন তিনি, দ্রুত পায়ে মেয়ের ঘরের দিকে এগোলেন। এই একটা কাজে কখনও ভুল হয় না তাঁর। মেয়েকে তিনি প্রচুর সময় দেন।

ফার্স্ট লেডিকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল গভর্নেস মিসেস কেনটারকি। আন্তরিক হাসিতে উল্লাসিত হয়ে উঠল প্রৌঢ়ার চেহারা। টিউলিপকে ছবির বই দেখাচ্ছে সে। মাকে দেখে ছুটে এল টিউলিপ। নিচু হলেন পামেলা, জড়িয়ে ধরে মেয়ে তাঁকে চুমো খেলো। সিধে হয়ে মেয়ের দু'কাঁধে হাত রাখলেন তিনি, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন মুখের দিকে। তাঁরই মত চেহারা পেয়েছে টিউলিপ, প্রায় গোল মুখ। তবে চোখ দুটো তাঁর চেয়েও সুন্দর, মায়াময়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার সেই ভয়টা ফিরে এল মনে। ঈশ্বর, ওর যদি কিছু ঘটে, স্রেফ মারা যাব আমি...।

'স্বামীর কাজ-কর্মে আপনার আগ্রহ আছে, মিসেস রিকার্ড?' জিজ্ঞেস করল সিনেটর।

ভদ্রতাসূচক ক্ষীণ হাসি দেখা গেল মার্গারেটের ঠোঁটে। স্টেট ডাইনিং রূমে বসে ডিনার খাচ্ছে ওরা। টেবিলের ওদিকে তাকাল সে। তার স্বামী, সি.আই.এ. চীফ, যুগোস্লাভ অ্যামব্যাসাডরের স্ত্রীকে পাশে নিয়ে বসেছেন, আরেক পাশে বসেছে বিখ্যাত

একজন কলামিস্ট। 'হ্যাঁ, অবশ্যই,' জবাব দিল সে। 'তবে অফিসটা কোথায়, কত ন'রে ডায়াল করলে তাঁকে পাওয়া যাবে, ইত্যাদি সাধারণ কয়েকটা ব্যাপার ছাড়া তাঁর কাজ সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না।' আজ আবার তার মনে হলো, জেফকে কিন্তু মোটেও সি.আই.এ-র চীফ বলে মনে হয় না। আচ্ছা, সি.আই.এ. চীফ কেমন দেখতে হলে মানায়? গম্ভীর আর রাশভারী? খুদে, ঝড়ো কাক, রহস্যময়? উঁহুঁ, জেফ এসবের ধারেকাছেও নয়।

জেফ রিকার্ডকে দশাসই বলা চলে, চেহারার মধ্যে সদা আড়ষ্ট একটা ভাব আছে, দেখতে অনেকটা মফস্বলের আনাড়ি উকিলের মত। চোখ দুটো উজ্জ্বল, তার দিয়ে তৈরি করা বাইফোকাল চশমার ফ্রেম নাকের ডগায় নেমে থাকে। সাদামাঠা মুখ, দ্রুত হাসতে পারে, মাঝে মধ্যে অতিরিক্ত বিনয়ী।

আপনমনে হাসল মার্গারেট। দেখে মনে হলেও, জেফকে ঠিক নিরীহ বলা চলে না। প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের সময় তাকে এমন সব নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিতে দেখেছে সে, মনে পড়লে এখনও তার গলা শুকিয়ে আসে। হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল চেহারা থেকে। ভাবল, জেফকে কি সত্যি আমি চিনি? এত বছর একসাথে আছি, তবু ওকে আমার প্রায়ই অপরিচিত মনে হয় কেন?

জবাব শুনে সশব্দে হেসে উঠল সিনেটর। 'চমৎকার উত্তর। পারফেক্ট পলিটিকাল ওয়াইফ—বিশ্বস্ত থাকার একমাত্র উপায় খুব বেশি না জানা।'

ডিয়ার গড!—মনে মনে আঁতকে উঠে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিল মার্গারেট। নারী-স্বাধীনতার সমর্থনে সারা দেশে যারা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে, তারাও কেন এখনও ভাবে যে রাজনীতিক স্বামীকে বাদ দিলে স্ত্রীর আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকে না? এবং কেন, কনওয়েদের ব্যক্তিগত বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও,

হোয়াইট হাউস ডিনার পার্টিতে সব সময় আজেবাজে লোকের পাশে বসতে হবে তাকে?

সিনেটরের দৃষ্টি এড়িয়ে মার্গারেট বলল, 'আপনি সমর্থন করায় আমি সুখী হলাম।'

মার্গারেটের আরেক পাশে বসেছে আরও কম বয়েসী একজন গেস্ট, প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট। লোকটা হাসতে পর্যন্ত জানে না! পামেলা যদি এসব ব্যাপারে একটু নজর রাখত!

'তবে একান্ত গোপনীয় কিছু কিছু কথা আপনাকে তিনি বলেন, তাই না?' সিনেটর নাছোড়বান্দা।

এবার তার দিকে সরাসরি তাকাল মার্গারেট। 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? জেফের কাজ সম্পর্কে আপনার এত আগ্রহ কেন বলুন তো?'

সিনেটর উত্তর দিল না। তার আরেকপাশে বসা এক লোক কি যেন জিজ্ঞেস করল, সেদিকে ফিরল সে। মার্গারেটের আরেক পাশে প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট গোগ্রাসে খাচ্ছে, যেন সারা বছর অভুক্ত ছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মনে মনে বলল মার্গারেট। এই সুযোগে সুপটুকু শান্তিতে খেতে পারবে সে।

মাত্র আটটা বাজে। ভোজন পর্ব সবে শুরু হয়েছে। আরও চারটে কোর্স বাকি। ওয়াইন আসবে দু'বার। আনুষ্ঠানিক আরও অনেক কিছু বাকি আছে। প্রেসিডেন্ট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন। সামরিক পোশাক পরে আসবে বেহালাবাদকদের একটা দল। হেড টেবিলের দিকে তাকাল মার্গারেট, বরাবরের মত অ্যাডাম্স্ ফায়ারপ্লেসের সামনে ফেলা হয়েছে সেটা। টেবিলের ওপর, দেয়ালে ঝুলছে লিংকনের পোর্ট্রেট। যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্টের সাথে গল্প করছেন ফার্স্ট লেডি। কে জানে, ভাবল মার্গারেট, পামেলা হয়তো সার্বো-ক্রোয়্যাটিয়ান ভাষাতেই কথা বলছে। আশ্চর্য সব ব্যাপারে অদ্ভুত দক্ষতা রয়েছে ওর। ভাল ছবি আঁকে, অনেকগুলো

ভাষা জানে, বাইবেলের ওপর একটা বই লিখেছে, প্রায় শেষ করে এনেছে ব্যায়ামের ওপর লেখা বইটা—আরও কত কি যে পারে পামেলা! সুন্দরীও বটে। গত দুই যুগে ওর মত আর কেউ আসেনি হোয়াইট হাউসে। আর রিচার্ড, যেমন লম্বা তেমনি স্বাস্থ্যবান, প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে কর্তৃত্ব।

স্নেহ আর দরদ উথলে উঠল মার্গারেটের মুখে। সৌন্দর্য, মর্যাদা, আর সুরুচির প্রতীক কনওয়ে পরিবার; অথচ সে অন্তত জানে, বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয়, অতটা সরল আর শান্তিময় জীবন নয় ওদের।

মার্গারেট দেখল, ঘরের চারদিকে চোখ বুলাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড কনওয়ে। একটা টেবিলে, একজনের ওপর স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি। চেহারায় আশ্চর্য একটা ভাব ফুটে উঠল, খসে পড়ল মুখোশ, বেরিয়ে এল ভেতরের আসল মানুষটা। সম্ভবত এক সেকেণ্ড বা তারও কম সময়ের জন্যে। তারপরই হাত বাড়িয়ে ওয়াইনের গ্লাস তুলে নিলেন তিনি, ফিরলেন, আগের মতই হাসছেন আবার।

ভুরু কুঁচকে চিন্তায় পড়ে গেল মার্গারেট। রিচার্ড কনওয়ের চেহারায় মুহূর্তের জন্যে কি দেখল সে? রাগ? সন্দেহ? ঘৃণা? নাকি আহত বিস্ময়?

তবে কার দিকে তাকিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট, মার্গারেট বোধহয় ধরতে পেরেছে। তার যদি ভুল না হয়, রিচার্ড কনওয়ে সরাসরি তাকিয়েছিলেন জেফ রিকার্ডের দিকে।

গম্ভীর আর ব্যস্তভাবে কাজ করছেন সিক্রেট সার্ভিস চীফ কীথ বিউমণ্ট। অফিস ছুটির পর তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই।

ঝনঝন শব্দে ফোন বেজে উঠল। প্রায় চমকে উঠে হাতঘড়ি

দেখলেন কীথ বিউমণ্ট। সর্বনাশ, আটটা বাজে! এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে ফোনের রিসিভার তুললেন কানে। কে ফোন করেছে জানেন।

'কীথ,' স্ত্রীর অসন্তুষ্ট গলা শুনতে পেলেন তিনি, 'এই তোমার সময়জ্ঞান?'

'দুঃখিত, ডিয়ার,' যথাসম্ভব শান্তভাবে বললেন এস.এস. চীফ। 'আমাকে মাফ করো, আজ আর সিনেমা দেখা হলো না।' স্ত্রী কিছু বলার আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি। তারপর ডেস্কের কাগজ-পত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন নতুন উদ্যমে। প্রেসিডেন্ট মেক্সিকো সফরে যাচ্ছেন। একাধিক সিকিউরিটি প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো অনুমোদন করতে হবে তার।

মেক্সিকোর রাজনৈতিক অবস্থা ভাল নয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও খারাপ, কাজেই সিকিউরিটি প্ল্যানে কোন খুঁত থাকা চলবে না। গত বছর মেক্সিকোয় দু'জন মার্কিন ব্যবসায়ীকে কিডন্যাপ করে সন্ত্রাসবাদীরা, প্রায় ওই একই সময়ে দূতাবাসের একজন অফিসার অল্পের জন্যে গুলি খাননি। কীথ বিউমণ্টের প্রধান দায়িত্ব প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করা। সফরটা বাতিল করার সুপারিশ করেছিলেন তিনি। কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাঁর কথা কানে তোলেনি। ওদের বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদীরা ঠিক সেটাই চাইছে। অসম্ভব, এক দল গুণ্ডার কাছে নতি স্বীকার করা যায় না। তাছাড়া, প্রেসিডেন্টের এই সফর নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

মুশকিল হলো, প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। স্টেট ডিপার্টমেন্টকে সমর্থন করেছেন তিনি। মেক্সিকোয় যাবেনই। কীথ বিউমণ্টকে এখন দেখতে হবে, তিনি যেন বহাল তবিয়তে ফিরে আসেন।

কাজ করতে করতে হঠাৎ অন্য একটা প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেল তাঁর। তাড়াহুড়ো করে একটা নোট লিখলেন তিনি। টিউলিপ

কনওয়েকে পাহারা দিচ্ছে ছ'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, তাদের সংখ্যা আরও দু'জন বাড়িয়ে আটজন করলেন। প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউস ত্যাগ করার পর টিউলিপের ওপর নজর রাখার জন্যে এই দু'জন অতিরিক্ত লোক দরকার হবে। এরপর আবার তিনি প্রেসিডেন্টের সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

রাত আটটায় আরও এক গাদা চিঠিপত্র নিয়ে কাজে বসল রানা। বিকেলের দিকে এগুলো পৌঁছে দিয়ে গেছে ডানিয়েল। কয়েকশো চিঠি, হয় হোয়াইট হাউস থেকে বাইরে গেছে, না হয় বাইরে থেকে হোয়াইট হাউসে এসেছে।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে এক এক করে বাতিল করতে লাগল রানা, ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল স্তূপটা। তারপর হঠাৎ করে একটা চিঠিতে দৃষ্টি আটকে গেল। চিঠিটা আবার পড়ল ও, পড়ল সঙ্গে গাঁথা অন্যান্য চিঠিগুলো। এরপর কাঁচি দিয়ে কেটে রাখা খবরের কাগজের একটা খবর বের করল এনভেলাপ থেকে। খবরটা ওয়াশিংটন পোস্ট-এ বেরিয়েছিল। খবর আর চিঠির তারিখ মেলাল ও।

মেলে।

আরও অনেক কিছু দরকার হবে। ব্যাকগ্রাউণ্ড জানার জন্যে ডোশিয়ে। চেহারার জন্যে ফটোগ্রাফ। হাবভাব আর আচরণ জানার জন্যে মুভি ফিল্ম। কণ্ঠস্বরের জন্যে টেপ-রেকর্ডিং। তবে এসব জিনিস সহজেই যোগাড় করা সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ হলো সেটআপ। সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক সময়।

আপন মনে হাসল রানা। প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিভাবে কিডন্যাপ করতে হবে জেনে ফেলেছে ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের আরেক মাথায় হেঁটে এল, দাঁড়াল স্টেরিও সেটের সামনে। কয়েকটা অ্যালবাম থেকে বেছে নিল একটা। ওস্তাদ বেহালাবাদক

হফ ভ্যানডেরবার্গের ভায়োলিন কনসার্ট।

চেয়ারে বসে নিঃশব্দে সিগারেট ফুঁকছে রানা, কনসার্ট বেজে উঠল। চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হলো ও। শুধু কিভাবে কিডন্যাপ করবে তাই নয়, টিউলিপকে কিভাবে আমেরিকা থেকে বের করে নিয়ে যাবে তাও জানা হয়ে গেছে ওর।

সাত

গাড়িটা সরকারি নম্বর লাগানো কালো একটা সিডান। সরকারি ন'রের সুবিধে হলো, অজায়গায় পার্ক করলেও ট্রাফিক পুলিস গাড়িটা সরিয়ে নিয়ে যাবে না, বা জরিমানা টিকেট লাগাবে না।

পোর্ট এলাকায় প্রচণ্ড ভিড়, এখানেও রানাকে কনুই আর হাঁটু চালাতে হলো। ফিফটি-সেকেণ্ড স্ট্রীটের পশ্চিম মাথায়, বিরানব্বই ন'র জেটিতে যেতে হবে ওকে। দূর থেকেই কুইন এলিজাবেথ টু কে দেখা গেল, রাতের আকাশকে আলোকিত করে নোঙর ফেলে আছে। প্রতিটি জেটির জন্যে আলাদা করে একটা বিল্ডিং, বিশাল হলরুমের ভেতরে ঢুকে নিউজস্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়াল রানা। অদূরেই কাস্টমস চেক-পোস্ট। এখুনি জাহাজ থেকে নেমে এদিকে আসবে আরোহীরা, তার জন্যে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে অফিসাররা।

হালকা নীল স্যুট পরেছে রানা, নিচে গাঢ় নীল শার্ট। খাস আমেরিকান সাজার জন্যে ছদ্মবেশ আর মেকআপ নিতে হয়েছে ওকে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সব কিছু বদলে

ফেলেছে। ছোট করে ছাঁটা চুল, পরিপাটি করে আঁচড়ানো। নির্লিপ্ত, শান্ত ভাব চেহারায়, দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে অসীম ধৈর্য। দেখে যে কেউ ভাববে, সরকারি কর্মচারী।

আরোহীরা জাহাজ থেকে নামতে শুরু করল। ঠাণ্ডা চোখে প্রত্যেকের ওপর চোখ বুলাল রানা। কয়েকশো ফটো আর ফিল্ম দেখে চেহারাটা মনে গেঁথে নিয়েছে ও, লোকটাকে একবার দেখলেই চিনতে পারবে। ফটো আর ফিল্ম তোলা হয়েছে লণ্ডনে, সাবজেক্টের অজান্তে ধোয়া অবস্থায় দু'দিন আগে রানার হাতে পৌঁছায় ওগুলো। অবসন মিথ্যে বলেনি, এমন কিছু নেই যা ওদের নাগালের বাইরে। পৃথিবীর যে-কোন প্রান্ত থেকে যে-কোন জিনিস আনিয়ে দিতে পারে সি.আই.এ। আপন মনে হাসল রানা, পারে না শুধু প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করতে।

বারবার পড়ে লোকটার ডোশিয়ে মুখস্থ হয়ে গেছে রানার। স্যাম গ্রেসন। ম্যানচেস্টার, ইংল্যাণ্ডে জন্ম। বয়স আটাশ। ছ'ফিট লম্বা। কালো চুল। খয়েরি চোখ। পেশায় ফটোগ্রাফার।

রানার সাথে শারীরিক গড়ন পুরোপুরি মেলে না, তবে তাতে কিছু এসেও যায় না। মেলে না চেহারাও, কিন্তু মেলানো হবে। রানার এখন যা গায়ের রঙ, লালচে সাদা, সেটাও স্যাম গ্রেসনের সাথে মিলবে না। গ্রেসন ধবধবে সাদা। তারমানে গায়ের রঙ আবার একবার বদলাতে হবে রানাকে।

হাতে সুটকেস আর কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এল স্যাম গ্রেসন। খবরের কাগজে মুখ লুকিয়ে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল রানা। পাঁচ মিনিট পর কাস্টমস থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রেসনও বেরিয়ে এল। কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরল রানা, গ্রেসন ট্যাক্সি ডাকার আগেই তার পথরোধ করে দাঁড়াল। 'মি. গ্রেসন? মি. স্যাম গ্রেসন?'

মুখ তুলল গ্রেসন, অবাক হয়েছে। 'জ্বী, হ্যাঁ। কেন বলুন

তো?’

‘জন রেইনার,’ বলল রানা। ‘ইউ.এস. সিক্রেট সার্ভিস।’ ভাঁজ খুলে একটা কার্ড দেখাল ও।

কার্ডে চোখ বুলিয়ে রানার দিকে তাকাল গ্রেসন। ‘কোথাও কিছু ভুল হয়েছে, স্যার?’

‘না,’ লোকটাকে আশ্বস্ত করে ক্ষীণ হাসল রানা। ‘ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙের জন্যে ক্লিয়ার‍্যান্স দেয়ার আগে আরও কিছু তথ্য চাই আমরা। সাথে গাড়ি আছে। যাবার পথে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন, আমি আপনাকে হোটেলে নামিয়ে দেব।’

‘বেশ তো,’ রানার সাথে হাঁটতে শুরু করে বলল গ্রেসন। মার্জিত যুবক, অক্সফোর্ডে শেখা উচ্চারণ ভঙ্গি। ডানিয়েলকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে রানা, গ্রেসনের গায়ে হাত তোলা চলবে না। কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে আটকে রাখা হবে ওকে। ‘আমার রূম রিজার্ভ করা হয়েছে হলিডে ইন-এ,’ রানা গাড়ি ছেড়ে দিতে বলল গ্রেসন।

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘জানি।’

নিঃশব্দে হাসল গ্রেসন। ‘তা তো জানবেনই, আপনাদের কাজই তো এই।’ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল গ্রেসন। ‘পোর্টে এসে পাকড়াও করলেন, নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।’

‘ক্লিয়ার‍্যান্স দেয়া দারুণ ঝামেলার ব্যাপার,’ বলল রানা। ‘কাজ তো আর একটা নয়, সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় আমাদের। আজ রাতে যে-করেই হোক আপনার সাথে দেখা করা দরকার ছিল, তাই হোটেলে না গিয়ে সরাসরি পোর্টে চলে এলাম। দু’জনেরই সময় বাঁচল।’

‘ধন্যবাদ,’ বলল গ্রেসন। ‘হলিডে ইন কি খুব দূরে?’

‘এমনিতে দূরে নয়, কিন্তু সিক্সথ্ এভিনিউ-এ আগুন লাগায় ওদিকের সব রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে। অনেকটা ঘুরে

যেতে হবে আমাদের।'

রানা জানে, নিউ ইয়র্কে এটাই গ্রেসনের প্রথম বেড়াতে আসা। তবে লণ্ডনে বসে ম্যানহাটনের ম্যাপ যোগাড় করা কঠিন কিছু নয়, পোর্ট থেকে হোটেলের দূরত্ব হয়তো জানা আছে ওর। সেজন্যেই একটা গন্ধ বানিয়ে বলতে হলো।

ফরটি-সেকেণ্ড স্ট্রীটে লাল আলো দেখে গাড়ি থামাল রানা, পকেট থেকে রূপালী সিগারেট কেস বের করে রানার সামনে খুলে ধরল গ্রেসন।

'না, ধন্যবাদ, ডিউটিতে রয়েছি,' বলল রানা। 'আমরা উনিশশো বিরাশি থেকে উনিশশো চুরাশি পর্যন্ত, এই দু'বছর সম্পর্কে জানতে চাই। দু'বছর আপনি ইংল্যাণ্ডে ছিলেন না।'

'না, অস্ট্রেলিয়ায় ছিলাম।'

লালের জায়গায় সামনে সবুজ আলো জ্বলে উঠল। শহরের দিকে নয়, দক্ষিণ দিকে ছুটল গাড়ি। 'কি করছিলেন?'

'বলতে পারেন বেড়াচ্ছিলাম। অবশ্য দু'একটা স্টুডিওতে কাজ করেছি। আর, হ্যাঁ, ছবি তুলেছি প্রচুর।'

'বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

গ্রেসন শুরু করল, কিন্তু রানা মন দিয়ে শুনছে না। সবই জানা আছে ওর। লোকটাকে কথা বলাবার পিছনে দুটো কারণ রয়েছে। সময়টা পার করা, আর গ্রেসনকে ব্যস্ত রাখা। গন্তব্যে পৌঁছুনোর আগে লোকটার মনে যেন কোন সন্দেহ না জাগে।

পনেরো মিনিট পর লোয়ার ম্যানহাটনে পৌঁছুল গাড়ি। এদিকের রাস্তাগুলো প্রায় অন্ধকার, রাস্তার ন'রে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নেই। বারো-র পর একশো এক, তেরো-র কোন খবর নেই। কত বার যে কত দিকে বাঁক নিল গাড়ি, দিশা পাওয়া অসম্ভব। ভাগ্যিস রানা আগেভাগে এসে সবটুকু রাস্তা দেখে রেখেছিল। তিনবার আসা-যাওয়া করেছে ও, ভুল হবার কোন

উপায় নেই। আরেকবার বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ক্যানাল স্ট্রীটে ঢুকল গাড়ি।

এতক্ষণে থামল গ্রেসন।

রানা বলল, 'গুড, এতেই চলবে। তবে, জানেনই তো, আপনার কথা যাচাই করতে হবে আমাদের। চিন্তার কিছু নেই, সব যদি সত্যি বলে থাকেন, ক্লিয়ার্যান্স পেতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না।'

'তবু কি রকম সময় লাগবে?'

শ্রাগ করল রানা। 'এক কি দু'দিন। চূড়ান্ত ক্লিয়ার্যান্স আসবে ওয়াশিংটন থেকে।'

মাথা ঝাঁকাল গ্রেসন।

'জানালা দিয়ে বাইরে তাকান, অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখতে পাবেন,' বলল রানা। 'এলাকাটাকে নিউ ইয়র্কের কলঙ্ক বলতে পারেন।'

'তাই!' আগ্রহী হয়ে উঠল গ্রেসন।

পরবর্তী ইন্টারসেকশনে পৌঁছে ডান দিকে বাঁক নিল রানা। চওড়া এভিনিউ, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে অসংখ্য খুদে বার আর সস্তাদরের নোংরা হোটেল। প্রতিটি হোটেল আর বারের সামনে খাদ্য, পানীয়, ইত্যাদির নাম এবং মূল্য-তালিকাসহ একটা করে ধুলো ঢাকা বোর্ড রয়েছে, বোর্ডের পাশেই অন্ধকার গর্ত—ওই গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। ফুটপাথ আছে, তবে আবর্জনার স্তূপে ঢাকা। সেই আবর্জনার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে অনেক লোক—সবাই ওরা নেশাগ্রস্ত মাতাল। ভিজে গায়ে নর্দমা থেকেও উঠতে দেখা গেল কয়েকজনকে। শুধু নিগ্রোরা নয়, ওদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গও রয়েছে।

আবার ডান দিকে বাঁক নিল রানা, চায়না টাউনকে পাশ কাটিয়ে এল। এরপর বাঁ দিকে মোড় ঘুরে ঢুকল লিটল

ইটালিতে। লাল আলো দেখে আরেকবার থামতে হলো।

পর্যটনের আনন্দ পেতে শুরু করেছে গ্রেসন। সারাক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে। 'স্বপ্নেও ভাবিনি নিউ ইয়র্কে এরকম জায়গা থাকতে পারে। সময় করে ওখানে একদিন যাব আমি...জায়গাটার নাম কি?'

'বোয়েরী। হ্যাঁ, নিউ ইয়র্ক দেখতে হলে প্রচুর সময় দরকার,' মন্তব্য করল রানা।

আলো বদলাল।

ওদের সামনে অন্ধকার রাস্তা। বাঁ দিকে একটা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউস। ডান দিকে সার সার দোকান, কিন্তু সবগুলো আজকের মত বন্ধ হয়ে গেছে। নাক বরাবর সামনে বহুতল আবাসিক ভবন, প্রতিটি জানালা হয় বন্ধ না হয় ভারী পর্দা ঝুলছে। রাস্তায় কোন আলো নেই, কারণ মদের পয়সায় টান পড়লে পাড়ার যুবকরা লাইটপোস্ট থেকে টিউব খুলে নিয়ে যায়।

গোটা এলাকার মাথায়, চল্লিশ পাড়া দূরে, এমপায়ার স্টেট বিল্ডিঙের আলো আকাশ ছুঁয়ে আছে। পিছনে এবং সামনে রাস্তায় রাস্তায় যানবাহন আর মানুষজনের ভিড়, এখান থেকে অনেকটা দূরে।

এদিকটা শুধু অন্ধকার নয়, সম্পূর্ণ নির্জন।

আরও খানিক দূর এগোল গাড়ি। হঠাৎ সামনে চোখ ধাঁধানো হেডলাইটের আলো জ্বলে উঠল। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল রানা।

'কি ব্যাপার?'

না, এখনও ভয় পায়নি গ্রেসন। হেডলাইটের পিছনে কি আছে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু রানা জানে একটা ভ্যান আছে।

আলোটা রাস্তার মাঝখানে। গ্রেসন অপেক্ষা করছে, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট আলোটাকে পাশ কাটিয়ে এগোবে। 'কি একটা জায়গা!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল সে। 'হোটেলটা নিশ্চয়ই এদিকে

কোথাও নয়?’

‘না,’ বলল রানা। ‘না, হোটেল এখান থেকে বহু দূরে, মি. গ্রেসন।’

দ্রুত রানার দিকে ফিরল গ্রেসন। চেহারায় ভয়ের কোন ছাপ নেই। বিস্মিত হয়েছে সে, একটু হকচকিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও অস্থির নয়। ‘সামনে কি? পথ ভুল করেছেন?’

গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিল রানা। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কি দেখল কে জানে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল গ্রেসন। ‘মি. রেইনার...।’ রানার হাত নড়ে উঠল, দেখে আঁতকে উঠল সে, পিছিয়ে সীটের কোণে চলে যাবার চেষ্টা করল, হাত দুটো আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে উঠে এল মুখের সামনে। ‘না! কেন! প্লীজ! গ...’ দরজার গায়ে হাতল হাতড়াতে শুরু করল সে, আতঙ্কিত চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

রাস্তা খালি। ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি খেলো গ্রেসন। এক ঘুসিতেই জ্ঞান হারাল সে।

রানা গাড়ি থেকে, আর ডানিয়েল ভ্যান থেকে নামল। ডানিয়েলের মুখে দু'দিনের না কামানো দাড়ি। হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চোখের নিচের কাটা দাগটা আগের চেয়ে লালচে দেখাচ্ছে। ফুটপাথ থেকে কেনা ধূসর রঙের স্যুট। মাথাভর্তি ধূসর চুল বাতাসে উড়ছে। শার্টটা এক বছর ধোয়া হয়নি। মনে মনে বিরক্ত হলো রানা, এমন নোংরা ছদ্মবেশ নেয়ার কি মানে!

কেউ কারও সাথে কথা বলল না। দু'জন ধরাধরি করে গাড়ি থেকে নামাল গ্রেসনকে। অজ্ঞান দেহটাকে তোলা হলো ভ্যানের পিছনে। দরজা বন্ধ করল ডানিয়েল, তারপর আলো জ্বালল। দ্রুত কাপড় বদলাতে শুরু করল রানা।

কাপড় বদলে কালো একটা মেটাল বক্স খুলল রানা। ভেতর থেকে বেরুল আয়না, চিরুনি আর ব্রাশ, তোয়ালে, চুল রঙ করার

তরল কলপ, চামড়া রঙ করার মলম, চোয়াল ফোলাবার জন্যে একজোড়া সিলিকন প্যাড, পাসপোর্টের ফটো পেজ, ইত্যাদি।

নতুন ফটো লাগানো পাতাটা গ্রেসনের পাসপোর্টে ব্যবহার করা হবে। কেমিকেলের সাহায্যে নতুন পাতাটাকে পুরানো চেহারা দেয়া হয়েছে, পাসপোর্টের বাকি অংশের সাথে যাতে মিল খায়। গ্রেসনের পাসপোর্ট থেকে ফটো লাগানো পাতা সরিয়ে ফেলা হবে। নতুন ফটোয় যার চেহারা দেখা গেল তাকে ঠিক হুবহু স্যাম গ্রেসনের মত মনে হবে না, আবার রানা বলেও মনে হবে না।

ত্রিশ মিনিট পর ফটোর চেহারা পেল রানা। নিজের চোখে নিজেই খয়েরি ক্যাপ লাগিয়েছে। আবার কালো করে নিয়েছে চুল। মোটা সোল-এর জুতো পরে ইঞ্চি দুয়েক লম্বাও হয়েছে। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। গ্রেসনের নয়, লণ্ডন থেকে আনানো শার্ট আর স্যুট পরে আছে। ওগুলো কেনা হয়েছে গ্রেসনের পরিচিত দোকান থেকে।

আয়নায় নিজেকে দেখে হাসল রানা। গ্রেসনের পরিচিত কারও সাথে দেখা না হয়ে গেলে, উতরে যাবে ও।

রানার গাড়ি হুস করে চলে গেল, সেদিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল ডানিয়েল। তারপর ভ্যানের দরজা বন্ধ করে গ্রেসনের দিকে ফিরল সে। মেঝেতে পড়ে আছে গ্রেসন, এখনও জ্ঞান ফেরেনি।

লোকটার কোন ক্ষতি করা চলবে না, বারবার সাবধান করে দিয়েছে রানা। নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে, যতদিন না বিপদ-মুক্ত সময় আসে। কিন্তু কত দিন, রানার কোন ধারণা আছে?

পরিচয় ফাঁস হবার ভয় রানার আছে বলে মনে হয় না। কার

নাম ফাঁস করতে পারে গ্রেসন, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট জন রেইনার? তাতে রানার কিছুই এসে যায় না। কিন্তু রানার মত আত্মবিশ্বাস ডানিয়েলের নেই। ডানিয়েল রানার মত ছদ্মবেশ নিতেও পটু নয়।

রানার ডোশিয়ে-তে লেখা আছে, নিরীহ মানুষের সাথে নিষ্ঠুর হতে পারে না ও। যারা এসপিওনাজ জগতে আছে তারা এটাকে গুণ বলে স্বীকার করবে না। এমন অনেক পরিস্থিতি দেখা দেয়, পাইকারী হারে নিরীহ মানুষ খুন করা দরকার হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতি প্রত্যেক এজেন্টের জন্যে পরীক্ষার মত, পাস করতে পারলে বিপদ কেটে যাবে, ফেল মারলে শুধু নিজে নয়, সংশ্লিষ্ট সবাই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ডানিয়েল নিজের ক্ষতি করতে চায় না। চায় না সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টরের ক্ষতি হোক। না, নিরীহ লোকদের প্রতি তার কোন দরদ নেই। গ্রেসন একটা হুমকি, লোকটাকে খতম করার জন্যে এটুকু জানাই তার জন্যে যথেষ্ট।

দ্রুত কাজে হাত দিল সে। অজ্ঞান দেহটা টেনে এনে দেয়ালের গায়ে বসার ভঙ্গিতে খাড়া করল। লেদার ব্যাগ থেকে এক বোতল হুইস্কি বেরুল। গ্রেসনের মুখ বাঁ হাত দিয়ে খুলে রাখল। বোতলের মুখ ঢুকিয়ে দিল দুই সারি দাঁতের মাঝখানে। গ্রেসনের মুখ থেকে বাঁ হাত সরিয়ে নিল সে, বাঁকা করা আঙুলের গিঁট দিয়ে চাপ দিল গলায়। গলার পেশীতে ঘন ঘন চাপ পড়ায় ঢোক গেলার ভঙ্গি করল গ্রেসন। অন্ধ অন্ধ করে হুইস্কি নামছে পেটে।

এরপর গ্রেসনের স্যুট, শার্ট, টাই, জুতো, আর মোজা খুলে নিল ডানিয়েল। নিজে যেমন পরে আছে, স্যালভেশন আর্মির বাতিল করা জুতো-জামা, গ্রেসনকেও তাই পরাল। কাজটা শেষ করে হাতঘড়ি দেখল সে। যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে, এতক্ষণে

নিশ্চই রক্তের সাথে মিশে গেছে হুইস্কি।

ব্যাগটা থেকে একটা মেটাল বক্স বের করল ডানিয়েল, বক্স থেকে বেরুল প্লাস্টিক সিরিঞ্জ। ভেতরে বাতাস ছাড়া কিছুই নেই। সুইয়ের মুখ অস্বাভাবিক সরু, চামড়ায় কোন দাগ থাকবে না। খুব সাবধানে গ্রেসনের বাহুতে সুইটা বেঁধাল সে, লক্ষ্য রাখল চাপ যাতে বেশি না পড়ে। প্লাঞ্জারে আঙুল রেখে মৃদু ঠেলা দিল, মুক্তি দিল বুদ্বুদটাকে। রক্তপ্রবাহের সাথে হার্টে চলে যাবে ওটা।

বাতাসের খুদে একটা বুলেট।

হলিডে ইনের পথে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে রানা, নিজের অজান্তে বোয়েরী-তে আবার ফিরে এল গ্রেসন। তাকে নিয়ে ভ্যান থেকে জড়াজড়ি করে, প্রায় গড়াতে গড়াতে নিচে নামল ডানিয়েল। চারপাশের বদ্ধ মাতালরা ওদের দেখেও দেখল না। নর্দমায় নেমে আবার উঠল ডানিয়েল, গ্রেসনকেও টেনে তুলল। তারপর অন্ধকার এক কোণে শুয়ে থাকল সে, পরস্পরের হাত-পা প্যাঁচ খেয়ে থাকল। দু'জনের চোখেই স্থির দৃষ্টি, যেন তাকিয়ে আছে কিন্তু দেখছে না কিছু।

খানিক পর উঠে হেঁটে চলে এল ডানিয়েল, পিছনে পড়ে থাকল গ্রেসন। এখানে কেউ গ্রেসনকে চেনে না। আরেকজন মাতাল। লাশকাটা ঘরে ঠাঁই পাবে। বেওয়ারিশ লাশ।

হলিডে ইনের ডেস্ক ক্লার্ককে পাসপোর্টটা দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। লোকটা পাসপোর্টের ওপর চোখ বুলাল শুধু, খুঁটিয়ে দেখল না।

ওপরতলায়, গ্রেসনের রির্জাভ করা কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করল রানা। বিছানায় উপুড় হয়ে শুলো, গ্রেসনের ফাইলগুলো পড়বে।

টেপ আর মুভি ফিল্ম ডানিয়েলকে দিয়ে এসেছে রানা, সব নষ্ট

করে ফেলা হবে। সাথে করে নিয়ে এসেছে ডোশিয়ে, স্টিল ফটো, এফ.বি.আই. রিপোর্ট, আর সিক্রেট সার্ভিস ক্লিয়ার্যান্স। ক্লিয়ার্যান্সটা সই করা হয়েছে তিন দিন আগে।

আর রয়েছে চিঠিগুলো, পঁচাত্তর হাজার থেকে ঘেঁটে উদ্ধার করা। এই পঁচাত্তর হাজারের ভেতর থেকেই স্যাম গ্রেসনকে আবিষ্কার করেছে রানা।

ওগুলো আবার একবার পড়তে শুরু করল ও।

'ডিয়ার মিসেস কেনটারকি,
আমাদের কখনও দেখা হয়নি, তবে মায়ের মুখে শুনতে শুনতে আপনার সম্পর্কে কিছু জানতে আমার আর বাকি নেই। ডরোথি গ্রেসনের বড় ছেলে আমি। আমার ছেলেবেলার অর্ধেকটাই কেটেছে আপনার আর মায়ের স্কুল-জীবনের গল্প শুনে। আমার আমেরিকায় বেড়াতে যাবার প্ল্যানটা যখন পাকা হয়ে গেল, মা আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, আপনার সাথে অবশ্যই আমি যেন দেখা করি।

এপ্রিলের উনিশ তারিখে কুইন এলিজাবেথ টু আমাকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক সিটি পোর্টে নোঙর ফেলবে। ওখানে আমি দু'রাতের জন্যে হোটেল রূম রিজার্ভ করেছি। তারপর ওয়াশিংটনে যাবার ইচ্ছে রাখি।

আমি জানি, প্রেসিডেন্টের মেয়ে টিউলিপ কনওয়েরর গভর্নেস আপনি। আমার ভারি শখ, সম্ভব হলে হোয়াইট হাউসটা এক বার দেখি। কিন্তু সম্ভব যদি না হয়, শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে যেখানে বলবেন সেখানেই আপনার সাথে আমি দেখা করব।

কোন ব্যবস্থা করা যাক বা না যাক, দয়া করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিখবেন। আপনার সাথে দেখা হওয়ার আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত থাকতে চাই না। মা আপনাকে ভালবাসা জানিয়েছেন।

আন্তরিকতার সাথে
স্যাম গ্রেসন।'

মিসেস কেনটারকি ক'দিন পরই জবাব দিলেন:

'ডিয়ার স্যাম,

ডরোথির ছেলে! চিনি, চিনি, তোমাকে আমি চিনি। ডরোথি এমন একটা চিঠি লেখেনি যাতে তোমার গন্ধ ছিল না। অবশ্যই আমার সাথে দেখা হবে তোমার। ডরোথির ছেলে আমেরিকায় আসবে, আর আমার সাথে দেখা হবে না, এ-ও কি সম্ভব!

তবে, দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, তুমি যখন আসবে আমি তখন ওয়াশিংটনে থাকব না। প্রেসিডেন্ট এবং মিসেস কনওয়ে মেক্সিকো সফরে যাচ্ছেন। তুমি নিউ ইয়র্ক থাকার সময় ওদের যাত্রা শুরু হবে। ওরা রওনা হবার পর আমিও টিউলিপকে নিয়ে মিশিগানে চলে যাব, খুকুমণির মামার বাড়ি।

তবু আমি তোমাকে হোয়াইট হাউস দেখাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি, তবে একটু ভেবে দেখো দেখি তোমার পক্ষে কি মিশিগানে আসা সম্ভব হবে?

তোমার মাকে আমার অগাধ ভালবাসা জানাবে।

প্রীতি এবং শুভেচ্ছা সহ
লুসি কেনটারকি।'

'ডিয়ার মিসেস কেনটারকি,

হ্যাঁ, মিশিগানে যাব আমি। প্লেনে করে ক্যালিফোর্নিয়া যাবার প্ল্যান আছে, ধারণা করছি মিশিগান বোধহয় পথেই কোথাও পড়বে। কখন এবং কোথায় দেখা করব জানাবেন।

শ্রদ্ধা জানবেন।

স্যাম গ্রেসন।'

‘ডিয়ার স্যাম,

তুমি আসতে পারবে শুনে কি যে খুশি হয়েছি! না, ক্যালিফোর্নিয়া আসার পথে মিশিগান পড়বে না, তবে পথ থেকে খুব একটা দূরেও নয়।

মিসেস কনওয়ের ভাই লেক মিশিগান, ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে বাস করেন, ওখানে আমরা উঠব। ম্যাপে চোখ বুলালেই তুমি দেখতে পাবে, জায়গাটা পেটোস্কি-র একেবারে কাছাকাছি। মিসেস ল্যাঙ্গার, টিউলিপের মামী, দু'এক রাত তোমার বেড়াবার কথা শুনে আপত্তি তো করেনইনি, বরং খুশি হয়েছেন। সিক্রেট সার্ভিসকে তোমার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি দিতে হয়েছে। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না। এ স্রেফ নিয়ম রক্ষা, অপরাধমূলক কোন কাজ যদি না করে থাকো, ক্লিয়ার‍্যান্স পেতে কোন সমস্যা হবে না।

কখন তুমি পৌঁছাবে, তাড়াতাড়ি জানাও আমাকে, স্যাম। তোমাকে দেখব এই আশায় অস্থির হয়ে আছি। প্রীতি এবং শুভেচ্ছা সহ।

লুসি কেনটারকি।’

গ্রেসনের আরও একটা জবাব আছে, কিন্তু রানা সেটা অন্যগুলোর সাথে সরিয়ে রাখল। আরও যা কিছু জানা দরকার, ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে পৌঁছে জানা যাবে। তার আগে, সামনের দুটো দিন, নিউ ইয়র্কে থাকতে হবে ওকে–গ্রেসনের ছদ্মবেশ নিয়ে। এই দু'দিন গ্রেসন যা করত, তাই করতে হবে ওকে। পকেট থেকে একটা কোয়ার্টার বের করল ও, ছুঁড়ে দিল শূন্যে, হাতের উল্টো পিঠে পড়ল সেটা। স্ট্যাচু অভ লিবার্টি। নিউ ইয়র্ক হারবার থেকে শহর দেখা শুরু করবে রানা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে গ্রেসনের ফাইল পুড়িয়ে ফেলল ও।

বাথরূমের সিঙ্কে আগুন নিভল, ট্যাপ খুলে দিতেই ছাইগুলো নেমে গেল নর্দমায়।

চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। মনটা যে শুধু খুঁত খুঁত করছে তাই নয়, কেন যেন মনে হচ্ছে কোথাও মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছে ও।

ভুলটা কি হতে পারে অনেক ভেবেও বের করতে পারল না রানা। এবার ব্যাগ থেকে নয়, পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করল। এনভেলাপের ওপর নানারকম সীল মারা। 'শুধু যার জন্যে প্রযোজ্য তার দেখার অধিকার আছে,' এই কথাটাও টাইপ করা রয়েছে। ভেতর থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল রানা। কাগজটার মাথায় হোয়াইট হাউসের প্রতীক চিহ্ন ছাপা রয়েছে, প্রেসিডেনশিয়াল রাইটিং প্যাড। আরেক মাথায় তারিখ লেখা—দিন, মাস, বছর সহ। প্যাডের মাঝখানে অল্প কয়েকটা লাইন টাইপ করা:

'এই কাজে আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। জরুরী একটা লক্ষ্য অর্জনের জন্যে টিউলিপকে অল্প ক'দিন নিজের কাছে রাখার অনুমতি মাসুদ রানাকে দেয়া হলো। এর জন্যে তাকে কোনভাবেই দায়ী বা অভিযুক্ত করা যাবে না।

প্রেসিডেণ্ট অভ ইউনাইটেড স্টেটস।'

নিচে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম সই করেছেন প্রেসিডেণ্ট। পরিচিত সই, নকল বলে মনে হলো না।

কাগজটা এনভেলাপে ভরে, এনভেলাপটা সযত্নে পকেটে রাখল রানা। কেউ যদি বেঈমানী করে, বা কোথাও যদি কোন ঘাপলা দেখা দেয়, প্রেসিডেণ্টের এই চিঠি রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে।

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের ওপর দিয়ে উদয় হলো মেরিন ওয়ান, ভোঁতা নাক আকাশের দিকে সামান্য উঁচু হয়ে আছে। হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ লনের দিকে এগোল সেটা।

কালো কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে লোকজনের ভিড় জমে উঠেছে। তবে আগেভাগেই চিন্তা করে হেলিকপ্টারের ল্যাণ্ডিং প্যাড এমন জায়গায় তৈরি করা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে সেদিকে এগোবার সময় দর্শকরা তাঁকে দেখতে পাবে না। সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, সেইই-স্ট্রীট পর্যন্ত। আবার হেলিকপ্টার টেক-অফ না করা পর্যন্ত রাস্তাগুলোয় কিছুই নড়াচড়া করতে পারবে না।

কোথায়, কোন্ রুট ধরে কোন্ দিকে যাবে হেলিকপ্টার, মিলিটারি পাইলট আর অল্প কয়েকজন সিকিউরিটি অফিসার ছাড়া কেউ তা জানে না।

মেরিন ওয়ানের গন্তব্য এনড্রু এয়ারফোর্স বেস। এয়ারফোর্স ওয়ান ওখানে প্রেসিডেন্টের জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রেসিডেন্টের মেক্সিকো সফরের জন্যে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে ক্রুরা।

হোয়াইট হাউসের ভেতরের মাঠে সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা মাথা নিচু করে ছুটোছুটি শুরু করল। সবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল মেরিন ওয়ান, রোটর ব্লেডের বাতাসে মাথায় এলোমেলো হলো চুল, গায়ে সেঁটে বসল শার্ট আর জ্যাকেট। ছুটে গিয়ে বিশাল যান্ত্রিক ফড়িং তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়ল। বাতাসের বাধা না থাকায় আবার হাঁটাহাঁটি শুরু করল লোকজন।

মিলিটারি অফিসাররা হ্যাচ খুলল, জায়গা মত বসিয়ে লক করল সিঁড়ি। কর্মচারীদের মুখ্য দু'জন সচিব ওয়েস্ট উইং দিককার ঝোপ ঘুরে বেরিয়ে এল, গম্ভীর রাশভারী চেহারা। হাতে ব্রীফকেস, কোন দিকে না তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে এসে

মেরিন ওয়ানে উঠে পড়ল তারা।

এরপর দেখা গেল ফার্স্ট লেডিকে। ডিপ্লোম্যাটিক এনট্রান্স দিয়ে বেরুলেন তিনি, প্রবেশ পথের ওপর রঙিন শামিয়ানা টাঙানো। ক্যামেরাগুলোর দিকে ফিরে মৃদু হাসলেন। হাত নাড়ালেন। তারপর মেয়ে টিউলিপের দিকে ফিরলেন। ভিড় এড়িয়ে, গভর্নেস মিসেস কেনটারকির সাথে দাঁড়িয়ে আছে সে, মুখে লজ্জা লজ্জা ভাব। মেয়ের সাথে দু'একটা কথা বললেন ফার্স্ট লেডি, গাল টিপে দিয়ে হাসলেন, দ্রুত একবার আলিঙ্গন করলেন, তারপর উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

সবশেষে এলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে দেখা মাত্র সাংবাদিকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। বৈদ্যুতিক আলোর মত তাঁর মুখে ঝিক্ করে উঠল হাসি। ঝুঁকে, মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন।

ক্লিক, ক্লিক...। অসংখ্য ক্যামেরা সচল হয়ে উঠল। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল তাঁর হাসি। গভর্নেসের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। 'ওর দিকে ভালভাবে নজর রাখবেন।'

মাথা ঝাঁকাল মিসেস কেনটারকি। মেয়ের সাথে কি মধুর সম্পর্ক প্রেসিডেন্টের, জানা আছে তার। বাপ এত্তোটুকুন মেয়ের সাথে এখনি এমন সব রসিকতা করেন, লজ্জায় তারই কান গরম হয়ে ওঠে মাঝে মধ্যে। চুমোর জন্যে মেয়ের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে প্রায়ই তিনি বলেন, 'অভ্যেস করো, তা না হলে বয়-ফ্রেণ্ডদের চুমো খেতে গেলে অসুবিধে হবে।' সবাই জানে, মেয়েকে তিনি সবার চেয়ে বেশি ভালবাসেন। মিসেস কেনটারকি প্রেসিডেন্টের হাত স্পর্শ করল, বলল, 'আপনি জানেন তা আমি সব সময় রাখি।'

'হ্যাঁ,' প্রেসিডেন্ট গলা পরিষ্কার করলেন। টিউলিপের দিকে

তাকালেন আবার। 'শান্ত হয়ে থেকো, মা,' বলে তিনি কোটের বাটন-হোল থেকে একটা গোলাপ কুঁড়ি খুলে মেয়ের মাথায় পরিয়ে দিলেন, তারপর অনেকটা যেন ঝোঁকের বশে, আলিঙ্গন করলেন মেয়েকে। বিড় বিড় করে বললেন, 'যীশু তোমাকে দেখবেন।'

মৃদু ঠেলা দিয়ে বাপকে একটু সরিয়ে দিল টিউলিপ। বাপের চোখে চোখ রেখে ঠোঁট টিপে হাসল সে। তারপর জড়িয়ে ধরল বাপকে, চুমো খেলো গালে।

মেয়েকে পাল্টা আদর করে নামিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে হেলিকপ্টারে উঠে গেলেন তিনি।

ইন্সপেক্টর বব হাডসনের চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি ফুটে উঠল। ডেস্কের ওপর দিয়ে ইউনিফর্ম পরা বিট পুলিসের দিকে রাগের সাথে তাকাল সে। 'বোয়েরী-তে আরেকটা মাতাল মারা গেছে, তো হয়েছেটা কি? এরকম তো প্রায়ই মারা যাচ্ছে।'

কেশে গলাটা পরিষ্কার করল বিট পুলিস। 'কিন্তু, স্যার, এই লোকটার ব্যাপার একটু অন্য রকম।'

'অন্য রকম মানে?' জিজ্ঞেস করল বব হাডসন, কুঁচকে উঠল ভুরু। ম্যানহাটন সাউথের হোমিসাইড ডিভিশনে নতুন এসেছে সে, চীফ হয়ে। বোয়েরী তার এলাকার মধ্যে পড়ে। ওখানকার মাতালদের কুকীর্তি সম্পর্কে শুনতে শুনতে এরই মধ্যে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে তার।

'লোকটার পরনে একটা আণ্ডারঅয়্যার ছিল,' বলল বিট পুলিস। 'আণ্ডারঅয়্যারে দোকানের নাম লেখা স্টিকার রয়েছে। রিজেন্ট স্ট্রীটের একটা দোকান, স্যার।'

'রিজেন্ট স্ট্রীট? কোথায় সেটা? ব্রুকলিনে নাকি?' জানতে চাইল হাডসন।

‘না, স্যার,’ বলল পুলিস লোকটা। ‘আমেরিকায় নয়, লণ্ডনে সেজন্যেই আমার মনে হলো...’

‘লণ্ডন, মানে ইংল্যাণ্ড?’ দাঁতের ফাঁকে চুরুট তুলতে গিয়েও থেমে গেল হাডসন।

মাথা ঝাঁকাল বিট পুলিস। ‘গায়ে কাপড়চোপড় যা রয়েছে, সব নোংরা, পুরানো, দু’এক জায়গায় ছেঁড়া। কিন্তু আণ্ডারঅয়্যারটা একেবারে আনকোরা নতুন। কিভাবে সম্ভব? তাও আবার লণ্ডন থেকে কেনা!’

‘তোমার সাথে কথা বলতে গিয়ে চুরুট নিভে গেল,’ অভিযোগের সুরে বলল হাডসন। ‘তবে, হ্যাঁ, তোমার সাবজেক্টটা ইণ্টারেস্টিং।’ নতুন করে চুরুট ধরিয়ে একগাল সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়ল সে। তারপর চিন্তিত দৃষ্টিতে পেট্রলম্যানের দিকে তাকিয়ে থাকল। ‘কাজেই, পোস্ট মর্টেমের নির্দেশ দিতে হয়। সব ব্যবস্থা করে ফেলো তাহলে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাথেও যোগাযোগ করো, বুঝলে। ফিঙ্গারপ্রিণ্ট চেক করো। হতভাগা আদম সন্তানটি কে ছিল আমি জানতে চাই।’

আট

ল্যাঙ্গার পরিবারের বাড়িটা খাঁটি ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্য রীতির নিদর্শন হলেও, মূল অংশের সাথে অন্যান্য যে-সব অঙ্গ-কাঠামো যোগ হয়েছে সেগুলোকে কোন রীতির সাথে মেলানো কঠিন। কোথাও কোথাও বারান্দার পরিসর ছোট করে সেখানে তোলা হয়েছে উদ্ভট আকৃতির ঘর, খামখেয়ালী করে যেখানে-সেখানে তৈরি করা হয়েছে দরজা বা জানালা। গোটা বাড়িটা দাঁড়িয়ে

আছে পাহাড়ের ঢালে, চারদিক থেকে গাছপালা দিয়ে ঘেরা, বাড়ি থেকে লেক মিশিগান পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। কাঁটাতারের ঘেরা আছে, সেটা নিচের বালুকাবেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। রাস্তার ধারের অন্যান্য বাড়িগুলোও বড় আকারের, পরস্পরের কাছ থেকে দূরে, এবং সুরক্ষিত।

বাড়িটায় ঢোকার দুটো মাত্র পথ—সৈকত একটা, অপরটা সামনের গেট। গেট খুললেই বাইরে গাড়ি-পথ, পথটা বড় রাস্তার সাথে মিশেছে। প্রেসিডেন্টের মেয়ে এখানে আসার পর থেকে দুটো পথই পাহারা দিচ্ছে ইউ.এস. সিক্রেট সার্ভিস। একটা পিঁপড়ে গলার উপায় নেই।

বুধবার সকাল, রানা স্যাম গ্রেসনের ভূমিকা নেয়ার পর দু'দিন পেরিয়ে গেছে। গাড়িটা সামনের গেটে থামাল ও, গেট-হাউস থেকে একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখে হাতল ঘুরিয়ে জানালার কাঁচ নামাল।

লম্বা-চওড়া লোক, পরনে সাধারণ একটা বিজনেস স্যুট, বুকের সামনে কোটের ভাঁজে লাল আর সাদা রঙ করা একটা পিন। বগলের কাছটা ফুলে নেই, কিন্তু রানা জানে শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে লোকটা।

সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, কাজেই বেল্টের সাথে আটকানো আছে ট্র্যান্সমিটার। তার দুটো দেখা গেল। একটা জ্যাকেটের ভেতর দিয়ে ওপর দিকে উঠেছে, কলারের কাছে বেরিয়ে একটা প্লাস্টিক প্লাগের সাথে জোড়া লেগেছে, প্লাগটা রয়েছে লোকটার কানের ভেতর, হিয়ারিং এইড-এর মত। অপরটা বেরিয়েছে বাঁ আস্তিন থেকে, হাত সমান উঁচুতে একটা মাইক্রোফোনের ভেতর ঢুকেছে সেটা।

মাইক্রোফোনের সুইচ সারাক্ষণ অন করা থাকে।

'গুডমর্নিং,' বলল রানা। লক্ষ করল, গেট-হাউসের ভেতর

আরও একজন লোক রয়েছে, কাঁচের জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে।

'আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল এজেন্ট।

'আমি স্যাম গ্রেসন।'

সামনের দিকে ঝুঁকল লোকটা, তীক্ষ্ণ চোখে ভেতরটা দ্রুত জরিপ করে নিল। 'ইয়েস, মি. গ্রেসন। আপনার আইডেনটিফিকেশন।' হাত পাতল সে।

গ্রেসনের পাসপোর্ট বের করল রানা, জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিল।

খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল এজেন্ট। মুহূর্তের জন্যে তাকে ইতস্তত করতে দেখল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে গেট-হাউসের দিকে লোকটা তাকাতে একটা হার্টবিট মিস করল ও। বিসমিল্লাতেই গলদ নাকি?

পাসপোর্ট থেকে চোখ সরিয়ে রানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল এজেন্ট। 'এক মিনিট।' সিধে হলো সে, ঘুরল, ব্যস্ত পায়ে এগোল গেট-হাউসের দিকে।

মনে সংশয় দেখা দিলেও আত্মবিশ্বাস হারাল না রানা। যেন সন্দেহ হয়েছে বা কোন জালিয়াতি ধরা পড়েছে, এরকম ভান করা সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের স্বভাব। আসলে হয়তো কিছুই না। আগন্তুকদের নার্ভ পরীক্ষা করার এটা একটা কৌশল। কান খাড়া করল রানা। কিন্তু গেট-হাউস থেকে মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। তবে দু'জনকেই দেখতে পাচ্ছে ও। আলোচনা শেষ করে দু'জনেই রানার দিকে ফিরল, জানালা দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর ওদের একজন হাত বাড়িয়ে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার।

সঙ্কটময় মুহূর্ত, শুরু না হতেই ব্যাপারটা কেঁচে যেতে পারে।

আত্মবিশ্বাসে একটু চিড় ধরল রানার। সাথে কোন অস্ত্রও নেই। স্যাম গ্রেসনকে সার্চ করা যেতে পারে, না-ও হতে পারে। ঝুঁকিটা রানা নেয়নি।

কথা শেষ করে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল লোকটা। সঙ্গীকে কি যেন ইঙ্গিত করল। সঙ্গী, প্রথম লোকটা, গেট-হাউস থেকে বেরিয়ে এল। সোজা রানার দিকে চোখ রেখে হেঁটে আসছে। তার হাবভাবে একটা ঢিলেঢালা ভাব রানার দৃষ্টি এড়াল না।

'সব ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছে, মি. গ্রেসন,' পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল এজেন্ট। 'আপনার লাগেজগুলো দেখতে হবে।'

'অবশ্যই।'

গাড়ি থেকে নেমে পিছনে চলে এল রানা, তালায় চাবি ঢুকিয়ে বুট খুলল। রানা এক পাশে সরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল এজেন্ট, তারপর ওর সুটকেসের ঢাকনি তুলে ভেতরটা নেড়েচেড়ে দেখল। অভ্যস্ত, দক্ষ হাত। প্রচুর সময় নিয়ে পরীক্ষা করল ক্যামেরা ব্যাগটা। দ্রুত হাতে খুলে ফেলল ক্যামেরার কয়েকটা পার্টস। প্রতিটি অতিরিক্ত ফিল্ম খুঁটিয়ে দেখল। ইতোমধ্যে ব্যাক সীটের পিছনে কাঁচ-ঢাকা জানালার কার্নিসে বার কয়েক তাকানো হয়ে গেছে। বাদামী কাগজে মোড়া বড়সড় একটা প্যাকেট রয়েছে ওখানে।

ক্যামেরা ব্যাগ রেখে দিয়ে রানার দিকে তাকাল এজেন্ট। 'প্যাকেটে কি?'

এক গাল হাসল স্যাম গ্রেসন ওরফে মাসুদ রানা। 'প্রেসিডেন্টের মেয়ের জন্যে সামান্য একটা উপহার।'

প্যাকেটটা ধরে নিজের দিকে টানল এজেন্ট। 'ভাগ্যিস উপহার প্যাকেট করার জন্য আলাদা কোন পয়সা দিতে হয় না।'

রানা একটু আহত হবার ভান করে জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে কি আপনারা...?'

'হ্যাঁ, মি. গ্রেসন। প্যাকেটটা ছিঁড়ে দেখতে হবে আমাদের। নিয়ম, ভাই। সমস্ত উপহার আমাদের পরীক্ষা করতে হয়। ওটা আপনাকে রেখে যেতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, 'ঠিক আছে।'

প্যাকেটটা বুকের সাথে চেপে ধরে গেট-হাউসের দিকে হাঁটা দিল এজেন্ট। মাঝপথে থামল সে, ফিরল রানার দিকে। 'এবার আপনি ভেতরে ঢুকতে পারেন। গাড়ি-পথের পর বাঁ দিকে বাঁক নেবেন। গ্যারেজটা পিছন দিকে। ওঁরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

এক এক করে দুটো রিপোর্টই পড়ল ইন্সপেক্টর বব হাডসন। থমথমে হয়ে উঠল চেহারা।

প্রথম রিপোর্টটা এসেছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে। হতভাগা আদম সন্তান যে ব্রিটিশ নাগরিক, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার, স্যাম গ্রেসন। ইয়ার্ডের ফাইলেই তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে—না, তার কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। এক সময় রয়্যাল এয়ারফোর্সে চাকরি করেছিল।

দ্বিতীয়টা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে বলা চলে অস্বাভাবিক কোন কারণে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, আশ্চর্য, হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকেও মারা যায়নি লোকটা। নার্ভাস সিস্টেম বা ব্রেনে কোন ক্ষতি হয়নি। রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণ প্রচুর, নেশাগ্রস্ত হবার জন্যে যথেষ্ট, তবে লিভার তাতে রিয়্যাক্ট করেনি বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে নির্জলা একটা সত্যই বেরিয়ে আসে। আটাশ বছরের এক যুবক মারা গেছে, অথচ বিশেষজ্ঞ

ডাক্তাররা মৃত্যুর কারণ বলতে পারছেন না। কিভাবে এবং কেন, কোন প্রশ্নেরই উত্তর তাঁদের জানা নেই।

এটাও একটা উত্তর। একটা প্রমাণ।

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল ইন্সপেক্টর বব হাডসন। স্যাম গ্রেসন কে জানে সে। কিন্তু লোকটা সম্পর্কে আরও অনেক কথা জানতে হবে তাকে। দেরাজ খুলে ভেতর থেকে একটা সরকারি ফর্ম বের করল সে। ফর্মটা পূরণ করে পাঠালেই ওয়াশিংটন, এফ.বি.আই.কমপিউটর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য এসে যাবে।

দরজায় একজন হাউজকীপার অপেক্ষা করছিল, পথ দেখিয়ে দোতলায় নিয়ে এসে রানাকে ওর কামরায় দিয়ে গেল। ছোটখাট মহিলা, আলাপী, হাসিটুকু লেগেই আছে মুখে। মি. গ্রেসন, আপনি এসেছেন শুনে মিসেস কেনটারকি যা খুশি হবেন না! কখন থেকে তাগাদা দিচ্ছেন আমাকে, দেখো না ছেলেটা এল কিনা! এই মুহূর্তে টিউলিপকে নিয়ে তিনি ব্যস্ত, ছাড়া পেলেই চলে আসবেন। বেশিরভাগ দিন একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ঘুমায় টিউলিপ। এই দু'ঘণ্টা, আর সাতটার পর—টিউলিপ যখন রাতের জন্যে বিছানায় ওঠে—ব্যস, নিজের সময় বলতে মিসেস কেনটারকির এটুকুই। বড় ভাল মানুষ, আমাদের মিসেস কেনটারকি। এত নরম।

ঠোঁটে মৃদু হাসি, কোমল দৃষ্টি চোখে, মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কিছু দরকার হলে রিঙ করবেন,' দরজার কাছে থেমে বলল হাউজকীপার। 'বসে বসে অপেক্ষা করতে যদি খারাপ লাগে, যেখানে খুশি বেড়িয়ে আসতে পারেন। সৈকতের দিকে যদি যান, ভাল লাগবে।'

'ধন্যবাদ, হয়তো একবার যেতেও পারি।'

একা হয়েই একটা সিগারেট ধরাল রানা, গ্রেসনের রূপালী

সিগারেট কেস টেবিলে রেখে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনেই লন, তারপর লেক। এক ধারে গাছপালার ফাঁকে গেস্ট হাউসের ছাদ দেখা গেল। জানালা দিয়ে যা কিছু দেখল, সব গেঁথে নিল মনে। ও জানে, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা গেস্ট হাউসটাকে অপারেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করছে। ওখান থেকেই তারা সরাসরি যোগাযোগ রাখে ওয়াশিংটন হেডকোয়ার্টারের সাথে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দুটো আগেই পেয়েছে রানা, হাউজকীপার জানিয়ে গেল, ওগুলো নির্ভুল। রাতে টিউলিপের শুতে যাবার সময়টা—সন্ধে সাতটা। আর, ইচ্ছে করলেই যখন খুশি বাড়ির সবখানে যেতে পারবে ও। এর আগে কাগজ-পত্রে দেখেছে ও, এখন ঘুরেফিরে নিজের চোখে দেখতে পাবে সব। চোখে দেখাটা জরুরী: বাড়ি থেকে লেক কত দূরে, কাঁটাতারের বেড়া কোত্থেকে শুরু হয়ে কোথায় থেমেছে, গার্ডরা কে কখন কোথায় থাকে।

মুখে সিগারেট নিয়ে জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। সুটকেস খুলে ভেতর থেকে কাপড়চোপড় বের করল। ও বের না করলে, চাকরদের কেউ করতে পারে। সুটকেসটা কেউ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করুক চায় না ও।

তবে চাকরবাকররা রহস্যটা ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট তো পারেনি। সুটকেসের তলায় একটা ফলস বটম রয়েছে, আসলে ঠিক ফলস বটম নয়; ওটাকে স্রেফ দ্বিতীয় একটা স্তর বলা যেতে পারে—আক্ষরিক অর্থে, তৃতীয় স্তর। ওখানে আর কিছু নয়, শুধু বাদামী, বেশ বড়, চ্যাপ্টা একটা ব্যাগ আছে। ফলস বটমের সাথে এমনভাবে সাঁটা, ওটার অস্তিত্ব টের পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এক্স-রে করলেও ধরা পড়বে না। সহজে খোলার কোন উপায় নেই। গোপন কোন কৌশল, ব্যাপারটা তাও নয়; লুকানো কোন লিভারও নেই। সেলাই খোলার জন্যে ছুরি

লাগবে।

রানা যে কোন ঝুঁকি নিচ্ছে, ঠিক তা নয়। প্ল্যানটা সফল করার জন্যে একটা জিনিস একান্তই ওর দরকার, বাদামী পেপার ব্যাগে করে সেটাই নিয়ে এসেছে ও। না, কোন আগ্নেয়াস্ত্র নয়। অস্ত্র নিয়ে আসার মত বোকামি করছে না ও।

তবে জিনিসটাকে খেলনাও বলা চলে না।

ইন্সপেক্টর বব হাডসনের কাছে এফ.বি.আই. রিপোর্ট পৌঁছুল। তিন হপ্তা আগে পর্যন্ত স্যাম গ্রেসনকে ওরা চিনত না। একুশ দিন আগে সিক্রেট সার্ভিস তার সম্পর্কে একটা সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের নির্দেশ দেয়। স্যাম গ্রেসন তদন্তে উতরে যায়, কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। তদন্তের রিপোর্ট সিক্রেট সার্ভিসকে পাঠিয়ে দিয়েছে এফ.বি.আই.।

সিক্রেট সার্ভিস? সিক্রেট সার্ভিস কেন স্যাম গ্রেসনকে নিয়ে মাথা ঘামাল?

একটা সিগারেট ধরাল বব হাডসন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে না সাপ বেরিয়ে পড়ে, ভাবল সে। রানার উপহার খুব কাজ দিল।

প্রথম দিনই সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা রানার ঘরে রেখে গেল ওটা। ডিনার সেরে ঘরে ফিরে দেখতে পেল রানা। পরদিন সকালে ও টিউলিপকে দিল ওটা।

কাগজের মোড়ক খুলল রানা, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রুদ্ধশ্বাসে টিউলিপ বলল, 'গ্রিজলি বেয়ার! ও মা, এ যে দেখছি আমার চেয়েও বড়!'

'প্রায়।'

'তুমি খুব ভাল,' মৌখিক হলেও, মূল্যবান একটা সার্টিফিকেট পেয়ে গেল রানা। ডান হাতের একটা আঙুল রানার মুখের সামনে তুলল সে। 'তোমার সাথে আমার চিরকালের ভাব হয়ে গেল।'

'ও, আচ্ছা, তাই নাকি?' টিউলিপের তর্জনীর সাথে নিজের তর্জনী এক করল রানা।

খেলনা ভাল্লুকটাকে আদর করতে করতে টিউলিপ বলল, 'তুমি একটা আনাড়ি।'

থতমত খেয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলো তো?'

'কিছু যদি না বোঝো, জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতে হয়, বুঝলে?'

'ও, আচ্ছা...!'

'থাক, আর ও-আচ্ছা করতে হবে না,' ভাল্লুকের গায়ে একটা হাত রাখল টিউলিপ, আরেক হাত পাকা গিন্নীর মত রাখল নিজের কোমরে। 'চিরকালের ভাব মানে বোঝো তুমি? মানে হলো, তোমার সাথে আমি কখনও আড়ি নিতে পারব না।'

'বাহ, খুব মজা হবে তাহলে... ।'

খিল খিল করে হেসে উঠল টিউলিপ। 'কিছুই দেখছি জানো না! যখনই আমি বললাম তোমার সাথে আমার চিরকালের ভাব হয়ে গেল তখুনি তোমার উচিত ছিল গালটা নিচু করা, আমি যাতে পা√ দিতে পারি।'

'দুঃখিত, ভুল হয়ে গেছে,' বলে ঝুঁকল রানা, ওর গালে চুমো খেলো টিউলিপ।

টিউলিপের সাথে পরিচয় কালই হয়েছে, কিন্তু মিসেস কেনটারকির বন্ধু হিসেবে রানাকে সে মিষ্টি একটু হাসি উপহার দিয়েই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, কাছে আসার বা ঘনিষ্ঠ হবার কোন চেষ্টা করেনি। এই বয়সেই তাজ্জব হবার মত ব্যক্তিত্ব মেয়েটার। তার সবকিছুর মধ্যে মার্জিত একটা ভাব রয়েছে। মনে মনে রানা খুশি, টিউলিপের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দরকার ছিল, সেটা পাওয়া গেছে।

ভাল্লুকটাকে নিয়ে মেতে উঠল টিউলিপ, সেদিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল রানা। মেয়েটার আনন্দ ওর মধ্যেও

সংক্রমিত হচ্ছে। এত দামী একটা উপহার দেখে মিসেস কেনটারকি মৃদু আপত্তি তুলল। রানা বলল, 'দোকানের শো-কেসে দেখে ঝোঁকটা সামলাতে পারলাম না।'

মিসেস কেনটারকি গর্বের ভাবটুকু চেহারায় লুকিয়ে রাখতে পারল না। এই উপহার হোয়াইট হাউসে তার মর্যাদা আরেকটু বাড়াবে। ওখানে ফিরে গিয়ে সবাইকে সে বলতে পারবে, আমার বান্ধবীর ছেলে দিয়েছে। চাপা হাসি ফুটল তার মুখে। 'তবে জিনিসের মত জিনিস, দিলে এই রকম উপহারই দিতে হয়। আমি খুশিই হয়েছি, স্যাম।'

'ধন্যবাদ, মিসেস কেনটারকি। টিউলিপ, দেখো দেখাই, হাত-পা কেমন নড়াচড়া করে...,' সামনের দিকে ঝুঁকে কোথায় চাবি আছে দেখিয়ে দিল ও।

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল টিউলিপ, নতুন করে মেতে উঠল খেলনাটাকে নিয়ে। হাত-পা শুধু সামনে আর পিছনে আসা-যাওয়া করে, কিন্তু টিউলিপ সেগুলোকে এ-পাশে ও-পাশে ঘোরাতে চেষ্টা করল। শক্ত করে তৈরি করা হয়েছে, সহজে ভাঙবে না।

সিগারেট ধরিয়ে মিসেস কেনটারকির দিকে ফিরল রানা। 'দেশে, মানে, লণ্ডনে কখনও যাবেন বলে মনে হয়?' মৃদু হেসে জানতে চাইল ও।

'বোধহয় না,' বলে টিউলিপের দিকে তাকাল মিসেস কেনটারকি। 'বাচ্চাটার সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি, বুঝতেই তো পারো। ও যেন আমারই সন্তান... ।'

মেঝে থেকে একটা চিৎকার উঠল।

কামরার অন্য মাথায় বসে রয়েছে একজন এজেন্ট, চমকে উঠে তাকাল সে। কোন বিপদ নয় বুঝতে পেরে আবার চেয়ারে হেলান দিল সে, মুখ গুঁজল পেপারব্যাক বইটায়।

টিউলিপের দিকে তাকাল রানা। প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা হয়েছে মেয়েটার, চোখে টলমল করছে পানি। ভাল্লুকটা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে কার্পেটে, একটা বাহু টিউলিপের হাতে। বাহুটার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে বেচারি। মুখ তুলে রানার দিকে একবার তাকাল, ভেজা দৃষ্টিতে অপরাধী ভাব।

'আশ্চর্য, হাতটা ছিঁড়ল কিভাবে!' চেয়ার ছেড়ে কার্পেটে উবু হয়ে বসল রানা। 'কই, দেখি তো!' টিউলিপের কাছ থেকে নিয়ে হাতটা পরীক্ষা করল ও। তারপর ভাল্লুকের গায়ে, যেখান থেকে হাতটা খসে গেছে, ভাল করে দেখল। ভেতরে সাদা তুলো দেখা গেল। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'কিসের সাথে আটকে ছিল কে জানে, গায়েব হয়ে গেছে।' অক্ষত দ্বিতীয় বাহুটা টেনে-টুনে পরীক্ষা করতে গেল ও, সেটাও খসে এল।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না টিউলিপ, ফুঁপিয়ে কেদে উঠল। তার মাথায় একটা হাত রাখল রানা। 'ছি-ছি, কাঁদে না। খুলে গেছে তো কি হয়েছে, আবার জোড়া লাগিয়ে দেয়া যাবে... ।'

ছুটে গিয়ে মিসেস কেনটারকির কোলে মুখ গুঁজল টিউলিপ। তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠল।

মিসেস কেনটারকির দিকে তাকাল রানা। নিচু গলায় বলল, 'আর জোড়া লাগানো গেছে! ওটা আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নতুন একটা আদায় না করে দোকানদারকে ছাড়ছি না!'

সেদিনই, আরও পরে, টিউলিপকে নিয়ে মিসেস কেনটারকি বাইরে বেড়াতে বেরুল। গার্ড হিসেবে কয়েকজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টও গেল ওদের সাথে। চাকরবাকর, কর্মচারী, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, সবার দৃষ্টি এড়িয়ে চুপিসারে দোতলায় নিজের কামরায় উঠে এল রানা। দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল

ও। না, ওর পিছু নিয়ে কেউ দোতলায় ওঠেনি। অন্তত করিডরে কারও পায়ের আওয়াজ নেই। ক্লজিট থেকে সুটকেসটা নামাল ও। ফলস বটমের চারদিকে ছুরি চালিয়ে বাদামী পেপার ব্যাগটা বের করল।

সন্তর্পণে দরজা খুলল রানা। সাথে সাথে ছুটে পালাল একটা বিড়াল। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল দেয়ালঘড়িতে। টিক টিক করে উঠল একটা টিকটিকি। ধীর পায়ে করিডর ধরে এগোল রানা। হলরুমে কেউ নেই, তবে একদিকের করিডরে ফিসফিস করে যুবতী চাকরানীর সাথে কথা বলছে প্রৌঢ় এক কর্মচারী। রানাকে দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল দু'জনেই, তাড়াতাড়ি সরে গেল ওখান থেকে।

হলরুমে কিছুটা সময় কাটাল রানা। এক সময় বুঝল, ধারে কাছে কেউ নেই। মিসেস কেনটারকির কামরার দিকে এগোল ও। পাশাপাশি দুটো কামরা, একটা টিউলিপের। দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। হলরুম থেকে মিসেস কেনটারকির ঘরে ঢুকল রানা। ঢুকেই আস্তে করে বন্ধ করে দিল দরজা।

মিসেস কেনটারকির ড্রেসিং টেবিল দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে। সাবধানে, কোন আওয়াজ না করে, দেয়ালের কাছ থেকে সেটাকে সরাল রানা। ড্রেসারের পিছনে হার্ডবোর্ড, টেপ দিয়ে তাতে পেপার ব্যাগটা আটকাল। টেবিলটা আবার জায়গা মত বসিয়ে চাপা নিঃশ্বাস ছাড়ল স্বস্তির।

মাঝখানের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলল রানা। দোরগোড়া থেকেই দেখতে পেল, খেলনা ভালুকটা বিছানার গোড়ায়, কার্পেটের ওপর পড়ে রয়েছে। কাছের একটা টেবিলে রয়েছে বাহু জোড়া। আপনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা, দরজা বন্ধ করে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে।

ওয়াশিংটন, সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার। ডেস্কে ফিরে এসে একটা চিরকুট পেল জেরি অ্যাডামস। চিরকুটে বলা হয়েছে, নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিসের ইন্সপেক্টর বব হাডসনকে টেলিফোন করতে হবে তার। খুবই নাকি জরুরী ব্যাপার।

রিসিভার তোলার জন্যে ফোনের দিকে হাত বাড়াল জেরি অ্যাডামস।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল হাতঘড়ির দিকে। সর্বনাশ! ডেপুটি ডিরেক্টরের সাথে মীটিং আছে না! সেটাও তো ভয়ানক জরুরী। উঁহুঁ, ইন্সপেক্টর বব হাডসনকে অপেক্ষা করতে হবে।

ল্যাঙ্গার পরিবারের সাথে নির্বিঘ্নে দুটো দিন কাটিয়ে দিল রানা। টিউলিপের মামার সাথে রাজনীতি, আর মামীর সাথে থিয়েটার নিয়ে আলাপ করল। ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর ছেলেকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলো মিসেস কেনটারকি, তবে টিউলিপের দায়িত্ব ঘাড়ে থাকায় খাতিরের নামে রানার ওপর অত্যাচার চালাবার সুযোগ পেল না সে। যাকে রানা চেনেই না, সেই গ্রেসনের মা সম্পর্কে মজার মজার গল্প শুনল রানা মিসেস কেনটারকির মুখে, সবই ছেলেবেলার। চাকরবাকর আর কর্মচারীদের সাথেও খুব ভাব হয়ে গেল ওর। সিকিউরিটি গার্ডরা সবাই গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু রানার সদা প্রসন্ন উপস্থিতি তাদের চেহারাতেও কোমল একটা ভাব এনে দিল। সুযোগ সময় পেলেই তাদের সাথে গল্প করল রানা। আর টিউলিপের সাথে, তাকে নিয়ে প্রচুর ছবি তুলল।

এমন মেহমান হয় না, একবাক্যে স্বীকার করল সবাই। যেমন ভদ্র, তেমনি মার্জিত। দ্বিতীয় দিনের শেষ ভাগে ওকে বিদায় নিতে দেখে সবারই মন খারাপ হয়ে গেল। মাত্র দু'দিনেই লোকটা যেন আপনজন হয়ে উঠেছিল।

টিউলিপের মামী আর মিসেস কেনটারকি সামনের ঘরে ওর

জন্যে অপেক্ষা করছিল। রাত আটটা। ব্যাগগুলো নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা।

মিসেস কেনটারকি বাড়িয়ে দিল হাতটা। 'এত তাড়াতাড়ি তুমি চলে যাচ্ছ, মেনে নিতে ইচ্ছে করছে না,' বলল সে। 'কথা দাও, সময় করে আবার একবার বেড়াতে আসবে।'

হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'আমেরিকায় এলে নিশ্চয়ই আসব।' মিসেস কেনটারকির পিঠে একটা হাত রাখল ও, ঝুঁকে চুমো খেলো গালে। 'মাকে আপনার গন্ধ শোনাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছি।'

গভর্নেসের চোখ ছলছল করে উঠল। 'স্যাম, তোমার মাকে আমার ভালবাসা জানাবে। বলবে, এরপর যেন তোমার সাথে সে-ও একবার এসে বেড়িয়ে যায়।'

'বলব। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখবেন। পৌঁছেই চিঠি দেব।' ব্যাগ তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। হঠাৎ থমকাল ও, দ্রুত ঘুরল। চেহারা দেখে মনে হলো, কি যেন মনে পড়ে গেছে। 'ধেত্তেরি, ভাল্লুকটার কথা একদম ভুলে গেছি!'

'তাই তো! কিন্তু…থাক না, স্যাম।'

'থাকবে মানে?' হেসে ফেলল রানা। 'এত শখ করে একটা উপহার দিলাম, তাও কিনা ভাঙা! কচি মেয়েটা কি রকম দুঃখ পাবে বলুন তো। না-না…।' ব্যাগগুলো মেঝেতে নামিয়ে রেখে, কারও দিকে না তাকিয়ে, সিঁড়ির দিকে হন হন করে এগোল ও।

ঘরে ঢুকে রানা দেখল, টিউলিপ ঘুমাচ্ছে। দরজা বন্ধ করল, কিন্তু তালা লাগাল না। দরজার সামনেই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল স্থির হয়ে, শব্দটা মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করল। না, বাইরে থেকে আসছে না। টিউলিপের নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ।

নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা। বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। জ্যাকেটের বুক পকেট থেকে এরই মধ্যে হাতে চলে এসেছে

একটা ঝর্না কলম। ক্যাপ খুলল, বেরিয়ে পড়ল সূঁচাল সিরিঞ্জের ডগা। ডগাটা টিউলিপের নগ্ন বাহুতে ঠেকাল ও।

প্লাঞ্জারে মৃদু চাপ দিল রানা। ধীরে ধীরে বাড়াল চাপ। পরিমিত মাত্রায় সোডিয়াম পেন্টোথাল পুশ করছে ও।

চামড়া ফুঁড়ে সূঁচের ডগা ভেতরে ঢুকতেই ঝাঁকি খেলো টিউলিপের হাত। তার হাতের সাথে রানার হাতও নড়ল, তবে চামড়ায় ঢুকে পড়া সূঁচের ডগা এক চুল কাঁপল না। মুহূর্তের জন্যে চোখ মেলল টিউলিপ, তারপরই ক্লান্তিতে বুজে এল। এই মুহূর্তে চেতন আর অচেতন অবস্থার মাঝখানে রয়েছে মেয়েটা। ওষুধের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলে, মারা যেতে পারে। মাত্রা বেশি হয়ে গেছে কিনা বুঝতে হলে মেডিকেল ইকুইপমেন্টের সাহায্য দরকার, কিন্তু সে-সব রানার হাতের কাছে নেই। নিজের বিচার বুদ্ধি আর আন্দাজের ওপর কাজ করছে ও। টিউলিপের বয়স, ওজন, ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে মাত্রা ঠিক করা হয়েছে, ভুল হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

ইঞ্জেকশন পুশ করার পর টিউলিপকে পরীক্ষা করল রানা। পালস রেট যা আশা করেছিল, তাই; বিচলিত হওয়ার মত কিছু নয়। হার্টবিটও নিয়মিত। বিছানার কাছ থেকে দ্রুত সরে এল রানা।

ড্রেসিং টেবিলের পিছনে হাত গলিয়ে বাদামী পেপার ব্যাগটা খুলে আনল ও। ব্যাগের ভেতর থেকে বেরুল একটা গ্রিজলি বেয়ার—বড়সড় আরও একটা খেলনা ভাল্লুক। এটারও বাহু নেই। তবে প্রথমটার সাথে দু'জায়গায় অমিল আছে। এটার ঘন পশমের ভেতর লুকানো চেইন আছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা, টানলে মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে খুলে যায় খেলনাটা। আর, ভেতরে কিছু নেই, চ্যাপ্টা। ভেতর দিকে বেলুনের মত কোমল গা। চাপ পড়লে বেলুনের মতই ফুলে উঠবে ভাল্লুক। প্লাস্টিক নাকের

ফুটোগুলো দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারবে।

চ্যাপ্টা ভাল্লুকটাকে মেঝেতে ফেলে সমান করল রানা। সিধে হয়ে আবার একবার পরীক্ষা করল টিউলিপকে। তারপর বুকে তুলে নিল তাকে। ওর পিছনে খুলে গেল ঘরের দরজা।

ধ্বক করে উঠল রানার বুক।

'স্যাম, আমি...।' মিসেস কেনটারকি বোবা বনে গেল। দোরগোড়ায় পাথর হয়ে গেছে সে। মুখ ঝুলে পড়ল, চোখ জোড়া বিস্ফারিত। আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠল তার চেহারা। 'স্যাম!'

টিউলিপকে বুকে নিয়েই মিসেস কেনটারকির দিকে এগোল রানা, এখন আর নামাবার সময় নেই। এক পা পিছিয়ে চৌকাঠের ওপর দাঁড়াল মিসেস কেনটারকি। রানার চেহারায় উদ্বেগ। 'দেখুন তো, টিউলিপ কেমন হাঁপাচ্ছে–বোধহয় অসুস্থ,' শান্ত গলায় বলল ও।

'অ্যাঁ? কি? ও, আচ্ছা, তাই বলো...।' এগিয়ে এল গভর্নেস, টিউলিপকে নেয়ার জন্যে বাড়িয়ে দিল হাত দুটো। এরই মধ্যে ঘাম দেখা দিয়েছে তার চেহারায়। তবে আগের চেয়ে অনেকটা শান্ত। হতভ' মনে হলো, কিন্তু আতঙ্ক কাটিয়ে উঠেছে।

প্রৌঢ়ার হাতে টিউলিপকে তুলে দিল রানা, কিন্তু মেয়েটার পিঠে একটা হাত থেকেই গেল। পিছিয়ে আসার ভান করে মিসেস কেনটারকির মুখের দিকে অপর হাতটা তুলল ও। চমকে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল মিসেস কেনটারকি। তার কানের পিছনে পৌঁছে গেল রানার হাত, আঙুল দিয়ে নার্ভ সেণ্টারে জোরে একটা খোঁচা মারল।

পিছুতে গিয়ে টিউলিপকে ছেড়ে দিল মিসেস কেনটারকি, অজ্ঞান দেহটাকে বাঁ হাতে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরল রানা। ডান হাতটা মিসেস কেনটারকির ঘাড়ের পিছনে চলে গেছে। দ্বিতীয় নার্ভ সেণ্টারে আরও একটা খোঁচা খেলো গভর্নেস। খোলা

মুখ দিয়ে চিৎকার বেরুবার আগেই টলে উঠল সে, আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল হাঁ। তীব্র ব্যথায় নীল হয়ে উঠল তার চেহারা। খালি হাতটা দিয়ে তার পতন রোধ করল রানা। মিসেস কেনটারকি জ্ঞান হারিয়েছে। তার হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। ঢিল পড়েছে মুখের পেশীতে।

গভর্নেসের বগলের তলায় ডান হাত রেখে, তার সাথে হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো রানা, বসল। আলতোভাবে কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়ল মিসেস কেনটারকি।

সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট জেরি অ্যাডামস আবার অফিসে ফিরল সাড়ে সাতটায়। ডেস্কে তখনও চিরকুটটা পড়ে আছে। হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল সে, ডায়াল করল নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিসের দফতরে। অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল ইন্সপেক্টর বব হাডসন। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল অ্যাডামস।

ইন্সপেক্টরের কথা শেষ হতে অ্যাডামস বলল, 'হয়তো আপনার কথাই ঠিক, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। স্যাম গ্রেসন সম্পর্কে কেন আমরা সিকিউরিটি চেকের ব্যবস্থা করেছিলাম, আমি জানি না। খোঁজ নিচ্ছি। ধন্যবাদ।'

এরপর রেকর্ড ডিভিশনের সাথে ফোনে যোগাযোগ করল অ্যাডামস। কি তার দরকার জানিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিক পরই তথ্যগুলো পেয়ে গেল সে।

স্যাম গ্রেসন মিসেস কেনটারকির বন্ধু। তাকে ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্টের মেয়ে! ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে টিউলিপ রয়েছে!

দ্রুত হাতে আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করল অ্যাডামস। কিন্তু লাইন এনগেজড। এক লাফে চেয়ার ছাড়ল সে, ঘর থেকে হলরূমে বেরিয়ে এল হন হন করে। প্রোটেকশন অফিসে ঝড়ের

বেগে ঢুকল সে। ডিউটি অফিসারকে গ্রাহ্য না করে সেকশন চীফের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,' দ্রুত, প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যাডামস। স্যাম গ্রেসন সম্পর্কে সব কথা, যতটুকু জানে সে, হড়বড় করে ব্যাখ্যা করল।

'কিন্তু তা সম্ভব নয়,' সেকশন চীফ মাথা নেড়ে বলল। স্যাম গ্রেসন মারা যায়নি। কাল সকালে ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে বহাল তবিয়তেই পৌঁচেছে সে। কথাটা শেষ করেই আঁতকে উঠল সে, চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কি ঘটেছে উপলব্ধি করতে পেরে এক সেকেণ্ড পাথর হয়ে থাকল সে। তারপরই ডাইরেক্ট লাইনের দিকে হাত বাড়াল। মিশিগানকে বিপদ সঙ্কেত দিতে হবে।

টিউলিপের মামী তখনও সামনের ঘরে বসে আছে, গল্প করছে একজন সিকিউরিটি এজেন্টের সাথে। সিঁড়িতে রানা উদয় হতে, দু'জনেই মুখ তুলে তাকাল।

রানার বগলের তলায় রয়েছে খেলনা ভাল্লুকটা। কোমরে ঠেকিয়ে রেখে, ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। যথেষ্ট ভারী, কিন্তু ধরে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হবে খুবই হালকা।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছে থামল ও। 'মেয়েটার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি,' বলল ও। 'ওর সাথে মিসেস কেনটারকি আছেন।'

মিসেস ল্যাঙ্গার হাসল। 'সময় করে আরেকবার এসো, বাপু। দু'দিনই মেয়েটা তোমার ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল। ক'টা দিন মন খারাপ করে থাকবে।'

'না এসে উপায় আছে,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'টিউলিপ আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে। চলি তাহলে, কেমন? এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে...।' খালি হাত দিয়ে

ক্যামেরার ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝোলাল ও।

সিকিউরিটি এজেন্ট ওর দিকে এগিয়ে এল। 'দিন, সুটকেসটা আমি নিয়ে যাই।'

মৃদু হাসল রানা। 'ধন্যবাদ, আমিই পারব। আপনি বরং দরজাটা খুলুন।' সুটকেস তুলল ও। 'ধন্যবাদ, মিসেস ল্যাঙ্গার। আপনাদের আতিথেয়তা আমি কখনও ভুলব না।'

'তোমাকে পেয়ে আমরা সবাই খুব আনন্দে ছিলাম।'

'গুডবাই।'

রানার গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে। পিছনের বনেট তুলে সুটকেসটা রাখল ও। ব্যাক সীটে ঠাঁই পেল খেলনা ভাল্লুক। হাত তুলে নাড়ল ও, শেষবার বিদায় নিল সবার কাছ থেকে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দরজা খুলে উঠে পড়ল গাড়িতে।

বিশ্বাস হচ্ছে না এত সহজে নিয়ে যেতে পারছে টিউলিপকে।

ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগোল গাড়ি।

ল্যাঙ্গার কটেজের পিছনে গেস্ট হাউস, ঝন ঝন শব্দে সেখানে একটা ফোন বেজে উঠল। ওয়াশিংটনের সাথে সরাসরি লাইন ওটা। ডিউটি-রত এজেন্ট রিসিভার তুলে এক মুহূর্ত অপরপ্রান্তের কথা শুনল। চোখের পলকে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা, রিসিভার ছেড়ে দিয়ে এক ছুটে কামরা থেকেই বেরিয়ে এল সে। কেউ দেখলে ভাববে, লোকটার গায়ে বোধহয় আগুন ধরে গেছে।

'গ্রেসন কোথায়?' সামনের ঘরে ঢুকেই চিৎকার করল সে।

মিসেস ল্যাঙ্গার মুখ তুলে তাকাল। থতমত খেয়ে গেছে। 'কেন, এইমাত্র তো চলে গেল। কিছু হয়েছে নাকি?'

তাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল এজেন্ট, একসাথে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠে এল দোতলায়। টিউলিপের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বার কয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল

সে। না জানি ভেতরে ঢুকে কি দেখবে!

দরজা ঠেলে ভেতরে তাকাল সে। পরম স্বস্তি বোধ করল সাথে সাথে। বিছানায় শুয়ে রয়েছে টিউলিপ। কিন্তু তারপরই নতুন করে ভয় পেল সে।

এক ছুটে ঘরে ঢুকল এজেন্ট। চাদরের নিচে শুয়ে রয়েছে টিউলিপ। কিন্তু চাদর নড়ছে না কেন? মেয়েটার নিঃশ্বাস...

ছোঁ দিয়ে চাদরটা তুলে নিল সে। হিম শীতল একটা অনুভূতি হলো তার। এত ভয় জীবনে কখনও পায়নি।

চাদরের তলায় টিউলিপ নয়, খেলনা ভাল্লুকটা রয়েছে। ঘরে কোথাও টিউলিপকে দেখা গেল না।

পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে সংবিৎ ফিরল তার। মিসেস ল্যাঙ্গারকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। 'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'টিউলিপ...।' বিছানার দিকে দৃষ্টি পড়তে মাথায় যেন বাজ পড়ল। চিৎকার করার জন্যে হাঁ করল সে। তাকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল এজেন্ট লোকটা।

নয়

মাত্র দশ মিনিট এগিয়ে থাকার সুযোগ পেল রানা।

ল্যাঙ্গার ভিলা থেকে একটাই রাস্তা চলে গেছে ইণ্ডিয়ান স্প্রিং শহরের দিকে। দশ মিনিট আগে এই রাস্তা দিয়েই গেছে রানা। একই রাস্তা দিয়ে এই মুহূর্তে একই দিকে ছুটছে সিক্রেট সার্ভিসের শক্তিশালী গাড়ি।

গাড়ির সামনে দু'জন এজেন্ট—একজন ড্রাইভ করছে, অপরজন রাস্তার ওপর চোখ রেখে কথা বলছে রেডিওতে; পিছনে

বসেছে আরও দু'জন, রাস্তার দু'দিকে ঘন বনভূমির ওপর তীক্ষ্ণ নজর বুলাচ্ছে তারা।

ছ'মাইল সামনে রয়েছে ইণ্ডিয়ান স্প্রিং শহর, এবং প্রথম চৌরাস্তা। চিন্তার কিছু নেই, রেডিওতে খবর পেয়ে আগেই রাস্তাগুলোর ওপর ব্যারিকেড তৈরি করেছে পুলিস। রোড-ব্লক বলে কোন যানবাহনই কোন দিকে যেতে পারবে না। ভুয়া স্যাম গ্রেসনের পালাবার কোন উপায় নেই।

হঠাৎ পিছনের একজন এজেন্ট চেঁচিয়ে উঠে আকাশের দিকে একটা হাত তুলল। ছোট একটা প্লেন, এই মাত্র গাছপালার ভেতর থেকে আকাশে উঠেছে। একটা পাইপার চেরোকি, কালো আকাশের গায়ে প্রায় মিশে আছে গাঢ় রঙের প্লেনটা।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার, প্রচণ্ড ঝাঁকি সামলে উঠেই লাফ দিয়ে বাকি তিনজন এজেন্ট রাস্তায় নামল। জঙ্গলে ঢুকে একটু পরই বেরিয়ে এল ওরা। ভুয়া স্যাম গ্রেসনের গাড়িটা রয়েছে ওখানে, বনভূমির মাঝখানে ফাঁকা একটা জায়গায়। ওখান থেকেই টেক-অফ করেছে প্লেন। ড্রাইভারের পাশের এজেন্টরা রেডিওতে কথা বলতে শুরু করল। সমস্ত এজেন্টকে চেরোকির ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিল সে। ড্রাইভার বসে নেই, মস্ত একটা ইউ টার্ন নিয়ে ভিলার দিকে ফিরে চলল সে।

গাছপালার ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে রাস্তায় তাকাল রানা। সিক্রেট সার্ভিসের গাড়িটাকে বাঁক নিতে দেখল ও। ভিলার দিকে ওরা ফিরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।

জানে, আরও গাড়ি আর লোকজন নিয়ে আবার ফিরে আসবে ওরা। বিভিন্ন সংস্থার ফেডারেল এজেন্টরা দলে দলে এসে ঘিরে ফেলবে গোটা বনভূমি, তন্ন তন্ন করে এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজবে। ডেট্রয়েট, শিকাগো, ওয়াশিংটন থেকে আসবে ফেডারেল

পুলিস আর এফ.বি.আই-এর অপারেটররা। কিন্তু এখুনি নয়, দেরি আছে, অন্তত ঘণ্টা দু'ঘণ্টার আগে নয়।

এখন শুধু পিছু লেগে থাকবে ল্যাঙ্গার ভিলার এজেন্টরা। তবে, শুরুতেই ওদেরকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব হয়েছে। ওরা জানে টিউলিপকে নিয়ে ভুয়া স্যাম গ্রেসন প্লেনে করে পালিয়েছে। ভুলটা এক সময় ভাঙবে ওদের, ততক্ষণে ওদের নাগালের বাইরে চলে যেতে হবে।

লেক মিশিগানের ওপর দিয়ে পশ্চিমে অদৃশ্য হয়ে গেছে চেরোকি। এবার নিজের পালাবার ব্যবস্থা করতে হয়। জঙ্গলের ভেতর ওর জন্যে একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটার রয়েছে। রেখে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কে রেখে গেছে রানা জানে না। হয়তো পাইলটকে দিয়েই কাজটা করিয়েছে ডানিয়েল। সেট অন করে ছোট্ট মেসেজ পাঠাল রানা, 'গোলাপ কুঁড়ি বলছি। ফোন কলটা এখুনি করো।'

দূরে কোথাও ডানিয়েলের একজন লোক মেসেজটা রিসিভ করল। সাথে সাথে সাড়া দিল সে, 'রজার, গোলাপ কুঁড়ি।'

এক ঝটকায় ট্র্যান্সমিটার অফ করল রানা। সেট বেশিক্ষণ অন করা থাকলে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যেতে পারে। রেডিও যোগাযোগ খুব সহজেই ট্রেস করা যায়।

ওখানে দাঁড়িয়ে কালো রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটা ধরল ও। ল্যাঙ্গার ভিলার দিকে আধ মাইল এগিয়ে থামল। সামনে একটা গাড়ি রয়েছে ওর জন্যে। ভেতরে নতুন পরিচয়-পত্র, ইত্যাদি। যেখানে যা থাকার কথা সবই আছে—সত্যি, কাজের লোক ডানিয়েল।

চাকরবাকর আর কর্মচারীরা মিসেস কেনটারকিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে

আছে। তার মাথায় পানি ঢালছে হাউজকীপার। গভর্নেসকে তার বেডরুমেই পাওয়া যায়, অজ্ঞান অবস্থায়। চাপা স্বরে কথা বলছিল সবাই, হঠাৎ থেমে গেল গুঞ্জনটা। মিসেস কেনটারকির জ্ঞান ফিরছে।

ফাদার কলার্ড কথা দিয়েছেন, এখুনি রওনা হবেন তিনি।

অফিস থেকে বেরিয়ে কালো ডজ ডার্ট-এ চড়লেন ভদ্রলোক। উত্তর দিকে বাঁক নিল গাড়ি, ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙের দিকে ছুটল।

যাজকদের যার যার এলাকা ভাগ করা থাকে। ল্যাঙ্গার পরিবার ফাদার কলার্ডের এলাকায় নিয়মিত বাস করে না। গ্রীষ্মকালে ভিলায় বেড়াতে আসে তারা, তখন প্রার্থনাসভায় হাজিরা দেয়। তবে বছরের শেষে চার্চের নামে ঠিকই পৌঁছে যায় চেকটা।

আজ হঠাৎ করে তাঁকে ওদের দরকার পড়েছে। ল্যাঙ্গার ভিলায় বড় ধরনের কোন অঘটন ঘটে গেছে। কেউ হয়তো অসুস্থ। অথবা মারা যাচ্ছে। ফোনে লোকটা পরিষ্কার করে কিছু বলেনি।

নির্জন, অন্ধকার রাস্তা। হেডলাইটের আলোয় ফাদার কলার্ড কিছুই নড়তে দেখলেন না। সামনে একটা বাঁক, গাড়ি ঘোরাবার সাথে সাথে ব্রেকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

রোডব্লক। রাস্তার দু'ধারে একজোড়া স্টেট পুলিস কার, দু'জোড়া হেডলাইটের আলোয় তিনজন ইউনিফর্ম পরা স্টেট পুলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবাই সশস্ত্র।

গাড়ি থামিয়ে জানালার কাঁচ নামালেন ফাদার। একজন লোক তাঁর দিকে এগিয়ে এল। স্টেট ট্রুপার, এলাকার কেউ নয়, ফাদার তাকে চিনতে পারলেন না।

'কোথায় যাচ্ছেন, ফাদার?'

'কেন, ল্যাঙ্গার ভিলায়। ওরা আমাকে ফোনে ডেকে পাঠাল।'

ঘাড় ফিরিয়ে বাকি দু'জনের দিকে তাকাল লোকটা। ওদের দৃষ্টি বিনিময়ের অর্থ ফাদারের বোধগম্য হলো না। জানতে চাইলেন, 'ব্যাপারটা কি? কিছু ঘটেছে?'

লোকটা তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'সাথে পরিচয়-পত্র আছে?'

'হ্যাঁ, কেন থাকবে না।' পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স, আর ক্লেরিকাল আইডেনটিফিকেশন কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিলেন ফাদার।

কাগজগুলো নিয়ে একটা গাড়ির কাছে ফিরে গেল লোকটা। ড্যাশবোর্ড থেকে রেডিও মাউথপীস তুলে কথা বলল সে। তার কথা কিছুই শুনতে পেলেন না ফাদার। তবে লক্ষ করলেন, বাকি লোক দু'জন তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। গাড়ি নিয়ে এগোবার পথ বন্ধ।

এক মিনিট পর গাড়ির কাছ থেকে ফিরে এল লোকটা। 'সব ঠিক আছে, ফাদার,' বলল সে। 'আপনি যেতে পারেন।' ফাদারের হাতে কাগজগুলো ফিরিয়ে দিল সে। তারপর নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল সঙ্গীদের।

'ধন্যবাদ,' ফাদার বললেন। 'জিজ্ঞেস করতে পারি, এ-সব কি নিয়ে?'

'দুঃখিত, ফাদার, আমাদের মুখ খোলা বারণ। তবে ওখানে পৌঁছে আপনি বোধহয় সবই জানতে পারবেন।'

বিশ মিনিট পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে গাড়ি ছুটাল রানা। কোথাও থামতে হলো না, ইণ্ডিয়ান স্প্রিং পেরিয়ে এল নিরাপদে। গাড়িটা এলাকার সবার পরিচিত—কালো একটা ডজ ডার্ট। ফাদার কলার্ড আর রানা, দু'জনের লাইসেন্স প্লেটও হুবহু এক। গাড়ি দুটোর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো, রানার ডজে

একটা ট্রাঙ্ক রয়েছে, ভেন্টিলেটর সহ। ভেতরে একটা খেলনা।

আরও দশ মাইল পেরিয়ে শহরের শেষ মাথায় পৌঁছুল রানা। ধীরে ধীরে স্পীড কমিয়ে দাঁড় করাল গাড়ি। সামনে রোড ব্লক। স্টেট পুলিস কারের দু'জোড়া হেডলাইটের আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজন ট্রুপার।

ট্রুপারদের একজন এগিয়ে এল। 'ও, আপনি, ফাদার,' বলল সে, 'ভিলার কি অবস্থা বলুন।'

'কি আর অবস্থা,' বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'সবাই খুব আতঙ্কিত। কোন খবর পাওয়া গেল?'

'এখনও কিছু কানে আসেনি। ফেডারেল পুলিস মুখ খুলতে চায় না। শুধু জানি, এখনও আমাদের ফিরে যেতে বলেনি।'

রানা গম্ভীর। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'যাই, বাড়ি ফিরে অপেক্ষা করি...'

'ঠিক আছে, ফাদার, যান। আবার হয়তো দেখা হবে।'

'মনে হয় না,' বলল রানা। 'অতক্ষণ আপনারা এখানে থাকবেন না বলেই আশা করি।'

জানালার কাঁচ তুলে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। জোড়া পুলিস কারের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে বেরিয়ে এল। সামনে একটা বাঁক, সেটা পেরিয়েই পিছন দিকে তাকাল একবার। নির্জন, অন্ধকার রাস্তা। গ্রে উইগ আর ক্লেরিকাল কলার খুলে ফেলল ও। তারপর ফুল স্পীডে ছোটাল গাড়ি। ব্যাপারটা ফাঁস হবার আগেই পালাতে হবে। ল্যাঙ্গার ভিলায় কখন ফাদারের ডাক পড়েছিল, ও জানে; জঙ্গলে অপেক্ষা করার সময় ফাদারের গাড়িটাকে যেতেও দেখেছে। কিন্তু ফাদারের ফেরত আসা ঠেকানো ওর ক্ষমতার বাইরে। আসল ফাদার হয়তো খুব একটা পিছনে নন।

পাইপার চেরোকির পাইলট মহা ফুর্তিতে গুনগুন করে গান

গাইছে। সরাসরি পশ্চিম দিকে কোর্স স্থির করেছে সে, এই মুহূর্তে উইসকনসিন বা কাছে-পিঠের কোন এলাকার ওপর রয়েছে। পরিষ্কার আকাশ, মৃদু বাতাস, হালকা প্লেন–তার মত অভিজ্ঞ পাইলটের জন্যে কাজটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কি। লোকটা বদ্ধ উন্মাদ, তা না হলে সামান্য এই কাজের জন্যে হাজার ডলার গুঁজে দেয় হাতে?

তবে, লোকটার শর্তটা কিন্তু অদ্ভুত ছিল। কোন প্রশ্ন করা যাবে না।

করেওনি সে। এক রাতে হাজার ডলার পেলে বেয়াড়া প্রশ্ন করার কি দরকার তার?

তার সামনে পাহাড়ী এলাকা দেখা গেল। সাবলীল ভঙ্গিতে প্লেনের নাক উঁচু করল সে, ছ'হাজার ফিটে উঠে এসে সমান হলো চেরোকি।

কানাডিয়ান সীমান্ত বরাবর এন.ও.আর.এ.ডি. পেট্রল ডিউটিতে ছিল এস.এ.সি. বম্বার, দশ হাজার ফিট উঁচুতে উড়ছিল। কনট্রোল টাওয়ার থেকে জরুরী নির্দেশ পেয়ে কোর্স বদল করল পাইলট।

রাডারে পাইপার চেরোকিকে দেখা গেল, পাঁচ মাইল সামনে, পশ্চিম দিকে যাচ্ছে, চার হাজার ফিট নিচে।

ইউ.এস. এয়ারফোর্স পাইলট ঘাড় ফিরিয়ে কেবিনের আরেক প্রান্তে বসা লোকটার দিকে তাকাল। 'চেরোকির পাইলট কিন্তু আমাদের খসাবার চেষ্টা করছে না।'

কো-পাইলট, একজন ক্যানাডিয়ান, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'না। একই কোর্সে, একই স্পীডে যাচ্ছে।' হঠাৎ, সীটের কিনারায় সরে এল সে, সামনের দিকে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রাডার স্ক্রীনে। 'আরে! নেই!'

'নেই?'

‘একেবারে গায়েব! ব্যাপার কি! চোখের পলকে কোন প্লেন ল্যাণ্ড করতে পারে না!’

‘তাই তো! তাহলে?’ আমেরিকান পাইলটের ভুরু কুঁচকে উঠল। ‘তবে কি…!’

ল্যাঙ্গার ভিলার গেস্ট হাউস। প্রথমবার বেজে উঠতেই ডিউটি রত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল।

‘খারাপ খবর,’ অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো তাকে। ‘তোমরা যে পাইপার চেরোকির ওপর নজর রাখতে বলেছিলে, উত্তর উইসকনসিনে বিধ্বস্ত হয়েছে সেটা।’

রিসিভারটা শক্ত করে চেপে ধরল এজেন্ট। প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে এল, ‘কেউ বেঁচেছে?’

‘বেঁচেছে মানে?’ পাল্টা প্রশ্ন এল অপরপ্রান্ত থেকে। ‘পাইলট ছাড়া কেউ থাকলে তো বাঁচবে!’

সাইনবোর্ডটা খুব জমকালো। কালকাসকা এভিয়েশন ইনকরপোরেটেড: ফ্লাইট ইন্সট্রাকশন, জি.ই.টি. সিমিউলেটর, এ.টি.পি. স্পেশালিস্ট, হ্যাঙ্গারস, টাইডাউনস, এয়ারক্রাফট ফর রেণ্ট অর লীজ। কিন্তু বিল্ডিংটা অস্থায়ী ব্যারাকের মত, আর কাউণ্টারের পিছনে বসে ছেলেটার এখনও মদ ধরার বয়স হয়নি।

তবে আজ সে কয়েকটা বিয়ার খেয়েছে। কেউ যদি মনের ভুলে একটা নয়, দুটো নয়, ছ’ছটা ক্যান রেখে যায় অফিসে, না খেয়ে উপায় কি তার? ফেলে দেবে নাকি? মাগনা?

কাউণ্টারের ওদিকে দাঁড়ানো খদ্দেরের দিকে লালচে, ঘোর লাগা চোখ মেলে তাকাল সে। উঁহুঁ, এলাকার কেউ নয়। কালা আদমি, তবে ব্যাটাচ্ছেলে সৌখিন বটে। দামী স্যুট, চোখে চশমা, সম্ভবত ডেট্রয়েটের কোন প্রফেসর বা হোটেল মালিক হবে। তার

দিকে একটু তেরছা চোখে তাকাল ছেলেটা, বলল, ‘এই মুহূর্তে শুধু একটা লীয়ার জেট আছে আমাদের। প্রচুর খরচ পড়বে, মিস্টার।’

পকেটে হাত ভরল খদ্দের, মানি ব্যাগ নয়, টাকার মোটা একটা বাণ্ডিল বের করল। ছানাবড়া হয়ে উঠল ছোকরার চোখ। ওরে সর্বনাশ! সবই একশো ডলারের নোট! ‘কত?’

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে উঠতে সময় নিল ছেলেটা। একজন কালা আদমির পকেটে এত টাকা! তাও আবার ক্যাশ! অত কথা কি, কোন সাদা চামড়ার কাছেও এত টাকা একসাথে দেখেনি সে। কে বাওয়া তুমি, কোথাকার লাটসাহেব? ধ্যেৎ, তা জেনে তার কি লাভ? কালো টাকা বা সাদা টাকা, তার কাছে সবই এক। ‘শুধু আপনি?’

‘সাথে আমার মেয়ে আছে,’ নিগ্রো লোকটা বলল। ‘বাইরে, গাড়িতে ঘুমাচ্ছে সে।’

ঝট্ করে মুখ তুলল ছেলেটা। এক ঘণ্টাও হয়নি স্টেট পুলিস টেলিফোনে সতর্ক করে দিয়েছে ওকে। চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি দিয়ে তাকে জানানো হয়েছে, ছোট্ট এক মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছে লোকটা।

কিন্তু এই লোকটা মেয়ের কথা গোপন করছে না। গায়ের রঙও ফর্সা নয়, চেহারার বর্ণনা বা বয়সও মেলে না। ছেলেটার পেশীতে ঢিল পড়ল, ঝুঁকে দেরাজ থেকে ট্রিপলিকেট ফর্ম বের করল সে। ‘ক’দিনের জন্যে দরকার আপনার?’

‘এক হপ্তা।’

‘কোথায় যাবেন?’

‘নর্দার্ন পেনিনসূলা। মারকেটের জন্যে প্ল্যান ফাইল করব।’

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। ‘ঠিক আছে—সাথে যদি তিন ধরনের আইডেনটিফিকেশন থাকে, সেই সাথে পাইলট’স আই.ডি.

তাহলে ব্যবসা হতে পারে।'

বিশ মিনিট পর টেক-অফ করল লীয়ার জেট। গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল সগর্জনে। উত্তর দিকে যাচ্ছে। খানিক পর নিচের এয়ারফিল্ড থেকে প্লেনটাকে আর দেখা গেল না। এবার নাক ঘুরিয়ে পুব দিকে ছুটল জেট।

গন্তব্য ওয়াশিংটন ডি.সি.।

দশ

ল্যাংলি, ভার্জিনিয়া, সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার। পটোম্যাক নদীর ওপর দিয়ে ডাউনটাউন ওয়াশিংটন বিশ মিনিটের পথ।

বিশাল ভবনের সাততলায় নিজের ডেস্কে বসে আছেন জেফ রিকার্ড, সি.আই.এ.চীফ। রাত পৌনে ন'টা।

কির কির করে যান্ত্রিক একটা গুঞ্জন উঠল। ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন রিকার্ড।

'এক্সকিউজ মি, স্যার,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল রিকার্ডের স্টাফ অ্যাসিস্ট্যান্ট, বাইরে অফিসে বসে আছে সে, 'জানি আপনি নিষেধ করেছেন, বিরক্ত করা চলবে না, কিন্তু ফোন করেছেন সিক্রেট সার্ভিস চীফ নিজে।'

বিরক্তির সাথে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন রিকার্ড। 'কীথ? কি চায় সে?'

'জানি না, স্যার; তবে খুব নাকি জরুরী।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন রিকার্ড। তারপর ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। 'বলো, কীথ।' এক মুহূর্ত, তারপরই তাঁর চেহারা থেকে সমস্ত বিরক্তির

ছাপ উধাও হয়ে গেল। নিজেও টের পেলেন না, ধীরে ধীরে শক্ত করে ধরেছেন রিসিভারটা, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটল কপালে। শুনছেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চাইছে না, আবার এ-ও জানেন, প্রতিটি শব্দ বাস্তব সত্য। পাথর হয়ে বসে থাকলেন চেয়ারে–বোবা, যেন বেকুব।

কীথ বিউমন্ট থামলেন। মাত্র একটা প্রশ্ন করলেন রিকার্ড, 'প্রেসিডেন্ট জানেন?'

'হ্যাঁ। মেক্সিকো থেকে রওনা হয়েছেন তিনি। পৌঁছেই আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন।'

সন্দেহ কি!

'থাকব ওখানে,' বিড়বিড় করে বললেন রিকার্ড। রিসিভার নামিয়ে রেখে নিঃসাড় বসে থাকলেন। সামনের সাদা দেয়ালে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

কি করে সম্ভব? কেন?

এত থাকতে প্রেসিডেন্টের মেয়ে কিডন্যাপ হলো!

কে দায়ী? কারা? কেন?

সি.আই.এ. চীফের গলা শুকিয়ে গেল। ঢোক গিলতে ভুলে গেলেন তিনি। ভাবলেন, উত্তরগুলো জানার আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেও বোধহয় মন্দ হয় না।

ডেস্কের ওপর মুষ্ট্যাঘাত করলেন প্রেসিডেন্ট। 'ড্যাম ইট, জেফ! সিক্রেট সার্ভিস ওখানে আমাকে তুলো দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। ওদের সন্দেহ প্রতিটি বিছানার তলায় টেরোরিস্ট লুকিয়ে আছে। মিশিগানে কি করছিল ওরা? এটা ওরা কিভাবে ঘটতে দিল?'

সাথে সাথে কোন জবাব দিলেন না জেফ রিকার্ড। অপেক্ষা করছেন, বিস্ফোরণের প্রকোপ আগে কমুক। রিচার্ড কনওয়েকে পঁচিশ বছর ধরে চেনেন তিনি, সেই কলেজ জীবন থেকে। এক

সাথে রাজনীতি করেছেন তাঁরা, কংগ্রেসে গেছেন, প্রেসিডেন্ট ইলেকশনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন, তারপর এখানে এই ওভাল অফিসে এসেছেন। জানেন, সঙ্কট যত জটিলই হোক এক সময় রিচার্ড কনওয়ে মাথা ঠাণ্ডা করবেন।

তবে এ-ধরনের সঙ্কটের কথা ভাবা যায় না। বন্ধুর দিকে তাকালেন তিনি। যুবক প্রেসিডেন্ট, বয়স এখনও পঞ্চাশ পুরো হয়নি। এমনিতে কোমল স্বভাবের, কিন্তু প্রয়োজনে কঠিন হতে জানেন। বিনা যুক্তিতে বুঝ মানার লোক নন। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ভালবাসেন। তাঁর অভিধানে অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই। সমাধান নেই, এ অজুহাত শুনতে তিনি রাজি নন।

রক্তে আভিজাত্য রয়েছে, অথচ রক্তপিপাসু যোদ্ধা কখনোই হতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট, তাঁর বন্ধু, সুকুমার বৃত্তির চর্চা করেন, শিল্প এবং শিল্পীর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। সন্দেহ নেই, তাঁর মত ব্যক্তিত্বকেই ওভাল অফিসে মানায়।

বাইরে থেকে অতটা বোঝা না গেলেও, এই মুহূর্তে ভেতরে ক্রোধান্ধ অসুরে পরিণত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। প্রিয়জনকে হারাবার আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত। কোন রাজনৈতিক সঙ্কট তাঁকে এতটা উত্তেজিত করতে পারত না, রিকার্ড জানেন। এমন একজন মানুষ, যিনি সারা দুনিয়ার সমস্যা সমাধান করে থাকেন—আজ হঠাৎ করে নিজেই বিকট সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছেন। তাঁর মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এখন তাঁর অন্য লোকদের ওপর নির্ভর না করে উপায় নেই। যত ক্ষমতাই তাঁর থাক, নিজেই তিনি মেয়েকে খুঁজতে বেরুতে পারেন না।

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জেফ রিকার্ডের চিন্তা-ভাবনা হঠাৎ অন্য খাতে বইতে শুরু করল। প্রেসিডেন্টের আচরণের মধ্যে কি রকম যেন একটা প্রচ্ছন্ন লোক-দেখানো ভাব

রয়েছে। নাকি চোখের ভুল? তাঁর বসার ভঙ্গিতে কোন আড়ষ্টতা নেই। মেক্সিকো সফর থেকে সদ্য ফিরেছেন, অথচ মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, পরনে সদ্য ভাঁজ খোলা ধূসর রঙের স্যুট, আলো লেগে ঝিক করে উঠছে হীরের আংটি। মনের ভেতর যাই ঘটে যাক, চেহারায় লাবণ্যের কোন কমতি নেই। উদ্বিগ্ন, কিন্তু কেমন যেন বানোয়াট মনে হয়।

না, নিশ্চয়ই ভুল বিশ্লেষণ করছেন তিনি।

চোখ থেকে চশমা খুলে কাঁচ দুটো মুছলেন রিকার্ড। রাত তিনটে বাজে, বিছানায় যাবার সময় পাননি। আবার কবে ঘুমাবেন, জানেন না।

'কেউ ঘটতে দেয়নি,' বললেন তিনি। 'এটা কোন পাগলের কাজ নয় যে সিকিউরিটি আরও কড়া হলে ঠেকানো যেত। না, ঝোঁকের মাথায় বা হঠাৎ করে কাজটা করা হয়নি। লোকটা প্রফেশনাল, হাইলি স্কিলড প্রফেশনাল।'

'আর সিক্রেট সার্ভিস?' সাথে সাথে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট। 'ওরা প্রফেশনাল নয়?'

'রিচার্ড,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জেফ রিকার্ড বললেন, 'ওরাও প্রফেশনাল। কিন্তু আমি ট্রেনিং পাওয়া বডিগার্ড সম্পর্কে বলছি না। বলছি স্কিলড ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট সম্পর্কে। সিক্রেট সার্ভিসকে তুমি দোষ দিতে পারো না।'

'আমার যাকে খুশি তাকে দোষ দেব!' বিস্ফোরিত হলেন প্রেসিডেন্ট। চোখে আগুন নিয়ে বন্ধু সি.আই.এ. চীফের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন, ধীরে ধীরে পড়ে আসছে রাগ। হাতটা একটু তুলে শূন্যে নাড়লেন তিনি। 'আমি জানি,' শান্তভাবে বললেন। 'অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের জন্ম দেয়।' আবার তিনি চোখ মেললেন। দৃষ্টিতে উদ্বেগ, কিন্তু চেহারা শান্ত। 'তুমি তাহলে তাই ভাবছ,

জেফ? বিদেশী কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি?'

চেয়ারে সিধে হয়ে বসলেন জেফ রিকার্ড। 'সে রকমই দেখাচ্ছে না? আর কার এত সাহস বা যোগ্যতা আছে? টেরোরিস্টদের কাজ নয়, এটুকু পরিষ্কার। কাজের ধরনই সে-কথা বলে দেয়। দলবেঁধে আসেনি ওরা, কমাণ্ডো হামলা চালায়নি। তবে আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা ছিল লোকটার। ছদ্মবেশে কোন ক্রুটি নেই, সময়ের চুলচেরা হিসেব ধরে কাজ সেরেছে। এ-সব গুণ একজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্টেরই থাকে।' এক মুহূর্ত থেমে ডেস্কের ওপর ঝুঁকলেন তিনি। 'তবে এ ধরনের ব্যাখ্যা এখুনি না করাই ভাল। কাউকে বাদ দেয়া বোকামি হবে। বিদেশী শত্রু, দেশী শত্রু, রাজনৈতিক শত্রু, তালিকায় সবাইকেই রাখতে হবে।'

'রাজনৈতিক শত্রু?'

প্রেসিডেন্টের দিকে সরাসরি তাকালেন রিকার্ড। 'যে-কেউ হতে পারে, রিচার্ড। তুমি অসহায় হয়ে পড়লে যারা লাভবান হবে তাদের যে কেউ কাজটা করিয়ে থাকতে পারে।'

প্রেসিডেন্ট তিক্ত একটু হাসলেন। 'তালিকাটা তাহলে শুধু লম্বাই হতে থাকবে। আমি অসহায় হয়ে পড়লে লাভবান হবে না এমন কেউ সত্যি আছে নাকি?' চেয়ার ছাড়লেন তিনি, পায়চারি শুরু করলেন। ফায়ার প্লেসের কাছে, জর্জ ওয়াশিংটনের পোর্ট্রেটের সামনে থামলেন, ঘুরে ফিরে এলেন বিশাল জানালার পাশে নিজের ডেস্কের পিছনে। মুহূর্তের জন্যে থেমে সবুজাভ বুলেটপ্রুফ কাঁচের গায়ে হাত বুলালেন। 'বিদেশী ইন্টেলিজেন্স,' যেন নিজের সাথে কথা বলছেন। তারপর ফিরলেন তিনি। 'তোমার কি মনে হয়, জেফ? কে.জি.বি.?'

'প্রচুর সম্ভাবনা।' কাঁধ ঝাঁকালেন রিকার্ড। 'আরেকদিক থেকে ভাবলে সম্ভাবনা ক্ষীণ।'

‘ক্ষীণ কেন?’

‘কারণ, সাংঘাতিক ঝুঁকি। যদি ধরা পড়ে অনেক কিছু হারাতে হবে ওদের।’

‘যদি ধরা পড়ে? যদি? আমরা টিউলিপকে নিয়ে কথা বলছি, ফর গডস সেক! আমার মেয়ের জীবন বিপন্ন, তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে! এরপরও তুমি বলছ, যদি ধরা পড়ে?’

না, ভান নয়; ভাবলেন রিকার্ড। ক্ষমতা ভোগ করলে বিনিময়ে চড়া মূল্য দিতে হয়, রিচার্ড কনওয়ের কাছ থেকে সেই মূল্য দাবি করছে প্রকৃতি। জেফ রিকার্ড বন্ধুর চেহারায় ক্ষীণ একটু অপরাধ ভাব লক্ষ করলেন।

‘খুন-খারাবির মধ্যে যাবে না ওরা,’ প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন রিকার্ড। বললেন জোরের সাথেই, কিন্তু নিজেই আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করলেন। ‘যে বা যারাই তাকে নিয়ে যাক, টিউলিপকে মেরে ফেলবে না। আমরা জানি, ওরা প্রফেশনাল। সত্যি কথা বলতে কি, এখানেই যা একটু সান্ত্বনা আমাদের।’

‘কিসের ভিত্তিতে এত জোর দিয়ে বলছ?’

‘বলছি, কারণ, আমাদের মেয়ে মারা গেলে তার আর কোন দাম থাকবে না।’

প্রেসিডেন্ট একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। ‘তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না যে ওরা টাকার জন্যে কাজটা করেছে?’

‘দাম শুধু টাকা দিয়ে মেটানো হয় না,’ বললেন রিকার্ড। ‘না, ওরা টাকা চাইবে বলে মনে হয় না। ইউ.এস. ট্রেজারির মাথায় যে বসে আছে তার জন্যে টাকা কোন সমস্যা নয়। যদি চায়, এমন কিছু চাইবে, দেয়া অসম্ভব বলে মনে হবে আমাদের।’

‘হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে তোমার সাথে আমি একমত,’ প্রেসিডেন্ট ধীরেসুস্থে আবার বসলেন চেয়ারে। মুখ নিচু করে নিজের হাতের

দিকে তাকিয়ে আছেন। 'বড় ধরনের কিছু একটা চাইবে ওরা। আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়, এমন কিছু।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড। মেয়েকে ফিরে পাবার জন্যে এমন কিছু নেই যা একজন বাপ দিতে পারেন না। অপরদিকে, বিশ কোটি মানুষের দায়িত্ব রয়েছে প্রেসিডেন্টের কাঁধে, তিনি তাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। বাপ আর প্রেসিডেন্ট, দুটো আলাদা সত্তা। কিডন্যাপাররা অসম্ভব কিছু দাবি করে বসলে দুই সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে।

'ওঁরা দু'জনেই জানেন, প্রেসিডেন্ট হারবেন, নাকি বাপ হারবেন। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষা করা।'

'জন্ধনাকন্ধনার সময় নয় এটা,' মুখ তুলে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'টিউলিপকে খুঁজে বের করতে হবে—জলদি। ওরা কোন দাবি জানাবার আগেই। সেজন্যেই তুমি এখানে। তোমাকে যতটা বিশ্বাস করি, আর কাউকে তার অর্ধেকও করি না। এফ.বি.আই. চীফের কথা ধরো। আমিই তাকে বেছেছি, কিন্তু মাত্র ছ'মাস হলো অফিসে বসছে। সে কতটুকু কি করতে পারবে আমার জানা নেই।'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন রিকার্ড। 'আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব আমি করব, রিচার্ড। কিন্তু, জানোই তো, আইন বলে কাজটা এফ.বি.আই-এর...'

'ঘরোয়া বলে? ঘরোয়া কিনা তা-ই তো জানি না। যদি বিদেশী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি দায়ী হয়ে থাকে, দায়িত্বটা তোমার ঘাড়েই চাপে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন রিকার্ড। 'তোমার সিদ্ধান্তের ওপর আর কথা কি।'

'হ্যাঁ, এটাই আমার সিদ্ধান্ত। তাছাড়া, জেফ, আমি

এফ.বি.আই.বা সি.আই.এ.-কে নিয়ে কথা বলছি না। বলছি তোমাকে নিয়ে। তুমি আমার বন্ধু, তোমার প্রতি এটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ। আমি চাই তুমি আমার মেয়েকে খুঁজে বের করো।'

কয়েক যুগ ধরে, ধীরে ধীরে জন্মে ওঠা আস্থা, বিশ্বাস, আর দাবি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ওঁরা। কিন্তু শুধুই কি আস্থা আর বিশ্বাস? এতগুলো বছর ধরে পরস্পরের প্রতি খানিকটা অবিশ্বাসও কি জন্মায়নি? খানিকটা ঈর্ষা? সামান্য বিদ্বেষ? বন্ধুত্ব বজায় আছে, কিন্তু অসন্তোষ কি একেবারেই নেই?

'শুধু সি.আই.এ. নয়, এফ.বি.আই.কেও তোমার হাতে তুলে দেয়া হলো,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'এমন কি সিক্রেট সার্ভিসও, যদি দরকার মনে করো। ট্রেজারি, ডিফেন্স, সামরিক বাহিনী–আমার সরকারের ক্ষমতার সমস্ত উৎস তোমার হাতে তুলে দিলাম।'

আপনা থেকেই নত হয়ে এল জেফ রিকার্ডের মাথা। গুরুদায়িত্বের ভার তিনি অনুভব করছেন। আগেই ধারণা করেছিলেন, এই সংকটে বড় একটা ভূমিকা পালন করতে হবে তাঁকে। হয়তো সবচেয়ে বড় ভূমিকাটা দেয়া হবে। কিন্তু তাই বলে এই? হাতের তালু এক করে ঘষলেন তিনি। ঘামে ভিজে গেছে। অগাধ ক্ষমতা, বিশাল দায়িত্ব, বিষম ঝুঁকি।

বিকল্প কোন পথ নেই। 'আমার সাধ্যমত করব আমি, রিচার্ড,' তিনি বললেন।

পামেলা কনওয়ের প্রেস সেক্রেটারি অসুস্থ বোধ করল। কিন্তু জানে, কাজটা এখুনি সারতে হবে। চেয়ারে সিধে হয়ে বসে টাইপরাইটারে কাগজ ঢোকাল সে। অভ্যস্ত দক্ষতার সাথে, সংক্ষিপ্ত ভাষায় টাইপ করে ফেলল প্রেস রিলিজ। অন্যান্য রুটিন

স্টেটমেন্টের সাথে এই খবরটাও যাবে।

'ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে টিউলিপ কনওয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ইণ্ডিয়ান স্প্রিংএে সে তার মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে। ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে বলেছেন, ব্যাপারটা গুরুতর কিছু নয়, তবে দিন কয়েক বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। আরও অন্তত এক হপ্তা প্রেসিডেন্টের মেয়ে ওয়াশিংটনে ফিরবে না।'

প্রেস রিলিজটা আগামীকাল ইস্ট উইং থেকে সাংবাদিকদের দেয়া হবে। তারা সম্ভবত খবরটাকে তেমন গুরুত্বের সাথে নেবে না।

মোটাসোটা একটা রিপোর্ট, পাতাগুলো উল্টে গেলেন জেফ রিকার্ড। চোখ থেকে চশমা খুলে হেলান দিলেন চেয়ারে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ালেন। আবার সিধে হয়ে বসলেন, ঝাঁক বেঁধে থাকা সুইচগুলোর একটায় চাপ দিলেন জোরে।

'ইয়েস, স্যার?'

'পিকেরিং-কে বলো, এখন আমি তার সাথে দেখা করতে পারি।'

'ইয়েস, স্যার।'

হেনরি পিকেরিং জেফ রিকার্ডের ডেপুটি, সি.আই.এ-র দ্বিতীয় ব্যক্তি। লম্বা, একহারা গড়ন, মাথার দু'পাশের চুলে সবে পাক ধরতে শুরু করেছে। পিকেরিং আগে ফিল্ড এজেন্ট ছিল, সেখান থেকে সরে এসেও মুটিয়ে যায়নি, তার প্রাণপ্রাচুর্য এবং রিফ্লেক্স আগের মতই অটুট আছে। সংশ্লিষ্ট ওয়াশিংটন মহলে 'বয় জিনিয়াস' বলে ডাকা হয় তাকে। তার এই খ্যাতির পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উর্বর মস্তিষ্ক, দুটোরই সমান কৃতিত্ব রয়েছে। বয়স এখনও পঁয়তাল্লিশ পেরোয়নি। ল্যাংলিতে কাজ করে সে।

পিকেরিং ঘরে ঢুকতেই মুখ তুলে তাকালেন জেফ রিকার্ড। সপ্রতিভ এবং ব্যগ্র, ভাবলেন তিনি। তাঁর ধারণা, পঁচাশিতেও পিকেরিং এরকম তাজা আর প্রাণচঞ্চল থাকবে।

'তোমার স্পেকিউলেশনগুলো পড়লাম, হেনরি,' বললেন তিনি। 'মন্দ নয়, কিন্তু...আরে, বসো!'

ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসে পা দুটো সামনে লম্বা করে দিল পিকেরিং। জেফ রিকার্ডের মতই, শুধু শার্ট পরে আছে সে। চোখের কোলে কালি, যেন কত দিন ঘুমায়নি। 'মন্দ নয় মানে, স্যার?'

রিপোর্টটার ওপর একটা হাত রাখলেন সি.আই.এ. চীফ। আড়াইশো পৃষ্ঠার একটা গবেষণা। কমপিউটর আর হিউম্যান ইনফরমেশন ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করা ডাটা-র সাহায্যে নিরেট একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেই ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে কিছু সাজেশন। 'ধারণা আর সাজেশন যথেষ্ট নয়, হেনরি,' বললেন তিনি। 'তাড়াতাড়ি অ্যাকশনে নেমে তাড়াতাড়ি ফল পাবার মত কিছু একটা করতে হবে আমাদের।'

দু'জনের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব নতুন নয়। এজেন্সি-চীফ পলিসি নির্ধারণ করে সেই মুহূর্তে রেজাল্ট চাইবেন, কিন্তু তাঁর ডান হাতকে কাজ করতে হয় বাস্তবতা নামে সীমাবদ্ধতার ভেতর। খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করল পিকেরিং, তারপর শুরু করল, 'এরপর আর কি করার আছে, আমার জানা নেই। ওঅর রূম-কে রেড অ্যালার্টের মধ্যে রেখেছি। পেন্টাগন আর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল-কে সতর্ক রাখা হয়েছে। দেশে আর দেশের বাইরে যেখানে যত স্টেশন চীফ আছে তাদের সবাইকে সাবধান করা হয়েছে। মিত্র দেশের সব ক'টা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সাথে যোগাযোগ রাখছি। এমনকি আন অফিশিয়ালি সামরিক বাহিনীকেও সতর্ক রাখা হয়েছে। জানি, এত সব করে

পরিবেশটাকে আড়ষ্ট করে তোলা হচ্ছে, অথচ কোন ফলাফল আশা করার উপায় নেই। ফল পাব, যদি নতুন কোন সূত্র হাতে আসে।'

'ইতিমধ্যে যেগুলো হাতে এসেছে?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলেন সি.আই.এ. চীফ।

'সেগুলোর ওপর কাজ হচ্ছে। কোত্থেকে কেনা হয়েছে খেলনা ভালুকটা, ভুয়া স্যাম গ্রেসনের গাড়িটা কোত্থেকে এল। প্রিস্ট ভদ্রলোককে কে ফোন করেছিল সেটাও জানার চেষ্টা করছি আমরা। স্যাম গ্রেসন আমেরিকায় আসছে এই খবর যারা জানত তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করা হবে। এফ.বি.আই. ল্যাবরেটরিতে প্লেনের প্রতিটি অংশ টেস্ট করব আমরা... ।'

'ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছি আমি,' ডেপুটিকে বাধা দিলেন জেফ রিকার্ড। 'প্লেনটা পরীক্ষা করে কিছুই আমরা জানতে পারব না। কিডন্যাপার ওটায় ছিলই না। ওটাকে ধোঁকা দেয়ার একটা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কৌশলটা কাজেও লাগে। গরু, বুঝলে, সিক্রেট সার্ভিসে ওরা একপাল গরু কাজ করছে।'

চেহারায় সহানুভূতি নিয়ে মাথা ঝাঁকাল পিকেরিং। 'ব্যাপারটা আমি বুঝি, স্যার। দারুণ অস্বস্তিকর—কারণ প্রেসিডেন্টকে বুঝ দেয়ার কাজটা একা আপনার ওপর চেপেছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হলো, খোলা একটা পথ না পেলে এই মুহূর্তে তেমন কিছু আমাদের করার নেই। প্রথম চাল ওদের, স্যার।'

রিকার্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'হ্যাঁ, অনেকটা দাবা খেলার মতই বটে, কিন্তু মুশকিল হলো বোর্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু, না, হেনরি—আমি অ্যাকশন চাই। কোথাও একটু ফাঁক থেকে গেলে, তার জন্যে যে-ই দায়ী হোক, তাকে আমি ক্ষমা করব না।' তাঁর হাত আবার রিপোর্টের ওপর নামল। 'এতে শুধু

গত ছ'মাসের হট স্পটস সার্ভে করা হয়েছে। আমি চাই দু'বছরের রিপোর্ট দাও তুমি। অ্যানালিস্টদের বলো, এই কিডন্যাপিঙের মোটিভ হতে পারে এমন যে-কোন অ্যাকটিভিটি খতিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। যে-কোন ধরনের, যে-কোন সময়ের, যে-কোন জায়গার।'

শার্টের পকেট থেকে একটা ইনডেক্স কার্ড বের করল পিকেরিং, নোট নিল।

'বললে, স্টেশন চীফদের সতর্ক করে দিয়েছ। কী ফিল্ড এজেন্টদের কথা ভাবোনি?'

'ধরে নিয়েছি স্টেশন চীফরাই...'

'ধরে নিলে চলবে না, হেনরি! সিদ্ধান্ত নাও কারা আমাদের টপ এজেন্ট, কাজ থেকে তুলে এনে এখানে জড়ো করো সবাইকে। প্রত্যেককে তুমি নিজে ব্রিফ করবে। বুঝতে পারছ না, আমাদের সমস্ত ক্ষমতা এই কাজে লাগাতে হবে! প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্মগুলোরও সাহায্য নিতে পারি আমরা। মিত্র দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর সাথে যোগাযোগ একটা কাজের কাজ হয়েছে...।'

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম, স্যার?'

'নয় কেন? শুধু দেশী নয়, বিদেশী ফার্ম যেগুলো খুব নাম করা তাদের সাহায্য নিতে আপত্তি কিসের?' এক মুহূর্ত স্মরণ করার চেষ্টা করলেন সি.আই.এ. চীফ। 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তো এর আগেও জটিল কিছু কাজ করে দিয়েছে আমাদের, তাই না? তবে...'

'জ্বী, স্যার,' বলল পিকেরিং। 'তবে ফার্মটার ডিরেক্টর মাসুদ রানা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

'মারা গেলে কি আর করা। কিন্তু ফার্মটা তো আর বন্ধ হয়ে যায়নি। তাছাড়া, খোঁজ নিয়ে দেখো সত্যি মাসুদ রানা মারা গেছে

কিনা। এর আগেও একবার তার মৃত্যুর খবর রটানো হয়েছিল। হয়তো কোন কারণে গা ঢাকা দেয়ার দরকার হয়েছে, তাই...'

'মনে হয় না, স্যার,' বলল পিকেরিং। 'খবরটা পাবার সাথে সাথে তদন্ত করে দেখা হয়েছে। রিপোর্ট পেয়েছি, খবরটা ভুয়া নয়।'

কাঁধ ঝাঁকালেন রিকার্ড। 'আমাদের দূতাবাসগুলোর পলিটিক্যাল অফিসারদেরও সতর্ক করা দরকার। ওদের বলো, বিদেশী ইন্টেলিজেন্স দফতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে খবর রাখতে হবে। কুখ্যাত টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর তৎপরতার ওপরও নজর রাখা জরুরী।'

কার্ডে আরেকটা নোট নিল পিকেরিং।

'হয়তো এই একবার অন্তত পলিটিক্যাল অফিসাররা এমন কিছু বলবে যা আমরা ইতিমধ্যে জানি না। ভাল কথা, জিজ্ঞেস করবে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কি বলার আছে। ওরা রিপোর্ট পাঠালে সেই মুহূর্তে আমাকে যেন দেখানো হয়। আরেকটা কথা, কোন রিপোর্টই সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে যাবে না, সবার আগে আমাকে দেখিয়ে নিতে হবে—এর যেন কোন ব্যতিক্রম না হয়।'

চেহারায় ক্ষীণ একটু বিস্ময় ফুটে উঠলেও পিকেরিং কোন প্রশ্ন করল না।

'এফ.বি.আই. চীফ,' বলে চললেন রিকার্ড, 'কি করছে না করছে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখো। ভদ্রলোকের ওপর আমার তেমন আস্থা নেই। ওভাল অফিসে কার কথা খাটে, উনি জানেন না।'

নিঃশব্দে হাসল পিকেরিং। 'একটু সময় দিন, স্যার। উনি শিখে নেবেন। কিন্তু, স্যার, ডিরেক্টরের সাথে আমার কোন যোগাযোগ হয়নি কখনও। এফ.বি.আই-এর ভেতরে আমার নিজস্ব লোক আছে—কয়েক বছর ধরেই।'

খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকালেন রিকার্ড। 'গুড।' জানেন, এ-সব কাজে পিকেরিঙের তুলনা হয় না। কাজের সুবিধের জন্যে সবখানে নিজের লোক ঢোকানো আছে তার। চেয়ার ছেড়ে জানালার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। নিচের পার্কিং লটে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, তবে বিল্ডিংটাকে ঘিরে থাকা ঘন গাছপালার বেড় আবছা অন্ধকারে ঢাকা। গাছগুলোর মাথার ওপর আলোর ক্ষীণ আভাস দেখা গেল। সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। 'শুধু একটা কথা মনে রেখো, হেনরি,' ঘাড় ফিরিয়ে ডেপুটির দিকে তাকালেন তিনি। 'ওয়াশিংটনের সব কটা সান-অভ এ বীচ চাইছে এই সুযোগে হিরো বনে যাবে।' তিনি ঘুরলেন। 'কিন্তু সুযোগটা একা আমি নিতে চাই।'

দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে, গাড়িটা পুব দিকে বাঁক নিয়ে ভার্জিনিয়া রুট একশো তেইশে পড়ল। সি.আই.এ-র ল্যাংলি হেডকোয়ার্টারের পাশ ঘেঁষে এগোল রানা, কিন্তু ভেতরে ঢুকল না। ওল্ড জর্জটাউন পাইক-এ পৌঁছে সামনে আরেকটা বাঁক দেখল, সেটা পেরিয়ে চলে এল টার্কি রান রোডে। এদিকে সব অভিজাতদের বাড়ি।

একজন কমপিউটর সেলসম্যান, রোজ সকালেই ব্রেকফাস্ট মীটিঙে উপস্থিত থাকার জন্যে ওয়াশিংটনে একবার আসতে হয়। আজও ঠিক সময়ে তাকে নিয়ে ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করেছে লীয়ার জেট। সেলসম্যানের বদলে, কিন্তু একই চেহারা নিয়ে, প্লেন থেকে নেমে এসেছে রানা, হাতে অ্যাটাচি কেস আর একটা গারমেন্ট ব্যাগ। এয়ারপোর্ট কর্মী আর ক্রুরা অনেকেই তাকে দেখেছে, পরিচিত লোক, কাজেই বিশেষ মনোযোগ দেয়নি কেউ। ফেডারেল পুলিস যে ব্যারিকেড তৈরি করেছে, সেখানে এয়ারপোর্টের লোকজনও ছিল, ব্যারিকেড

পেরোতেও তাই কোন অসুবিধে হয়নি।

পুলিস যদি খোঁজ নিত, সহজেই ট্রেস করতে পারত ওর ফ্লাইট প্ল্যান। নক্সভিল, টেনেসি থেকে হুবহু একই চেহারার একটা লীয়ার জেট টেক-অফ করেছে, ঠিক যখন রানা মিশিগান ত্যাগ করে। সেটা অন্য কোথাও, সম্ভবত কোন প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে ল্যাণ্ড করেছে। কমপিউটর সেলসম্যান বেচারা এই মুহূর্তে কোথায়, কেউ তা জানে না। প্লেনে চড়ার জন্যে বাড়ি থেকে ঠিকই বেরিয়েছে সে, কিন্তু এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার ভাগ্য তার হয়নি। মাঝ রাস্তা থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। তার নিখোঁজ হওয়ার জন্যে দায়ী রানা এজেন্সির এজেন্টরা, কিন্তু রানা ছাড়া সে-কথা আর কেউ জানে না। পাইলটকে বলা আছে, ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে দ্বিতীয় লীয়ার জেটটা নিয়ে যাবে সে।

আবার ডান দিকে বাঁক নিল রানার গাড়ি। বনভূমির গভীরে প্রবেশ করছে ও। মাইলখানেক এগোবার পর রাস্তার ধারে একটা লেটারবক্স চোখে পড়ল, গায়ে সদ্য আঁকা একজোড়া লাল গোলাপ কুঁড়ি।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে পথ দেখিয়ে পিছনের গ্যারেজে নিয়ে এল ডানিয়েল। ভেতরে ঢুকল গাড়ি, দরজা বন্ধ করে দিল ডানিয়েল। বলল, 'একেবারে কাঁটায় কাঁটায়।'

শুধু একটু মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আপনার আরোহী কেমন আছে?'

'এখনও ঘুমিয়ে।'

চেইন টেনে গারমেন্ট ব্যাগটা খুলল রানা। এ-ধরনের ব্যাগ বাজারেই কিনতে পাওয়া যায়, সাধারণত গারমেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো ব্যবহার করে। কয়েক জোড়া স্যুট সুন্দরভাবে রাখার মত জায়গা থাকে ভেতরে। কিন্তু রানার এটা শুধু বাইরে থেকে দেখতে গারমেন্ট ব্যাগের মত, ভেতরে অন্য রকম।

মহাশূন্যচারীদের জন্যে বিশেষ এক ধরনের স্পেস স্যুট তৈরি করেছিল নাসা, তার নমুনা সংগ্রহ করে খুদে একটা স্পেস স্যুট তৈরি করেছে রানা। স্পঞ্জ, তুলো, আর ফোম দিয়ে তৈরি, ভেতরে শুয়ে বা বসে থাকতে পারে ছোট একটা বাচ্চা, বাতাস চলাচলের যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। ব্যাগের ভেতর পাতলা ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি কাঠামোয় আটকানো রয়েছে স্পেস স্যুট। ফ্রেমের ওপর থেকে কিছু কাপড়চোপড় সরাল রানা, তারপর ঢাকনি সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে টিউলিপের দিকে তাকাল। নরম কুশনে হেলান দিয়ে আরামে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। পালস আর শ্বাস পরীক্ষা করল রানা, তারপর আরেকটা ইঞ্জেকশন দিল। সোডিয়াম পেন্টোথালের বদলে ভ্যালিয়াম ব্যবহার করছে ও, ট্রাংকুইলাইজার হিসেবে কড়া না হলেও নিরাপদ। এবারও, মাত্রা ঠিক থাকল, অচৈতন্যের অগভীর স্তরে নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্যে পৌঁছে গেল টিউলিপ।

গ্যারেজে আরেকটা বাহন রয়েছে। ডানিয়েলের ইঙ্গিতে সেদিকে এগিয়ে গেল রানা।

'সুন্দর, তাই না? হুবহু আসলটার মত দেখতে।'

লম্বা, কালো একটা বাহন, মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবার কাজে ব্যবহার করা হয়। শবযানের সাইড ডোরে খুদে, সোনালি হরফে লেখা রয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি। 'হ্যাঁ, হুবহু,' একমত হলো রানা। পিছনের দরজা খুলে ভেতরে তাকাল ও।

মেঝেতে একটা ফাঁক রয়েছে, কফিন আকারের। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, বারো ইঞ্চি নিচে দ্বিতীয় মেঝেতে। 'ভেতরে যেটা ঢুকবে সেটা কই,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ইনসার্ট?'

'এখানে।' পথ দেখিয়ে গ্যারেজের সামনের দিকে চলে এল ডানিয়েল। লম্বা, চ্যাপ্টা আকৃতির একটা বাক্স দেখল রানা। মাটি থেকে এক ফুট উঁচু হয়ে আছে। বাক্সটা সতর্কতার সাথে পরীক্ষা

করল ও। ঢাকনি তুলল। তালাগুলো খুলল। 'ফিট হয় কিনা ঢুকিয়ে দেখেছ?'

'কোন খুঁত নেই।'

'গুড।'

'একটা প্রশ্ন,' বলল ডানিয়েল।

চোখ তুলল রানা।

ইঙ্গিতে শবযানটা দেখাল ডানিয়েল। 'মি. অবসন জানতে চেয়েছেন আপনার প্ল্যানের মধ্যে ওটা কিভাবে আসছে।'

ক্ষীণ একটু হাসল রানা। 'অবসনকে বোলো, চিন্তিত হবার কারণ নেই। খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারবে সে।'

এগারো

পরদিন, শনিবার, ছ'টা বেজে কয়েক মিনিট।

হোয়াইট হাউসের উল্টো দিকে, লাফায়েটি স্কয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহুতল হে-অ্যাডামস হোটেল। হোটেলের সুসজ্জিত লবিতে ধীর পায়ে ঢুকল রানা। জানা সত্ত্বেও ডেস্কের পিছনে বসা লোকটাকে রকি ডুরেলসনের রূম নাম্বার জিজ্ঞেস করল ও। তারপর লবির অপর প্রান্তে হাউস ফোনের দিকে এগোল।

রকি ডুরেলসন দ্রুত জিজ্ঞেস করল, 'ইয়েস?' অত্যন্ত ব্যস্ত লোক সে, সোয়ানটেক্স করপোরেশনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল, অপ্রত্যাশিত ফোন কলে বিরক্ত হয়েছে।

'মি. ডুরেলসন, আমার নাম হ্যালোরান,' বলল রানা। 'স্টেট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি।'

‘ইয়েস?’

‘আপনার যদি খানিক সময় হয়, দেখা করতে চাই।’

‘এখন?’

‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা জরুরী।’

অপরপ্রান্তে ইতস্তত করতে লাগল রকি ডুরেলসন। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে। একটু পরই আমি বাইরে বেরিয়ে যাব।’

‘ইয়েস, স্যার, জানি। এখুনি উঠে আসছি আমি।’

এলিভেটরে চেপে ছ’তলায় উঠল রানা, কার্পেট মোড়া করিডর ধরে বাঁ দিকে মোড় নিল। কামরার দরজা খুলে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রকি ডুরেলসন। তার পরনে টক্সেডো প্যান্ট, ফরমাল শার্ট, বো-টাই। ধূসর চুল ব্যাকব্রাশ করা। চেহারায় ব্যস্ত আর বিরক্ত ভাব। ‘কি এমন জরুরী ব্যাপার যে শনিবার রাতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এসে হাজির?’ রানা ঘরে ঢোকার পর দরজা ঠেলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল সে।

‘সত্যি কথা বলতে কি, অত্যন্ত নাজুক একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, স্যার,’ বলল রানা। লক্ষ করল, রকি ডুরেলসন নিজেও বসছে না, ওকেও বসতে বলছে না। ‘অস্ট্রিয়ান সরকার আমাদের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে।’

‘প্রতিবাদ?’ রকি ডুরেলসন আকাশ থেকে পড়ল, কিছুই বুঝতে পারছে না সে। ‘কি নিয়ে প্রতিবাদ?’

‘কয়েকজন অস্ট্রিয়ান অফিশিয়ালকে পেমেন্ট দেয়ার ব্যাপারে। আপনাদের করপোরেশন পেমেন্ট করেছে...’

ডুরেলসনের চিবুক ঝুলে পড়ল, রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। ‘কি ধরনের ননসেন্স এটা, শুনি? ত্রিশ বছর ধরে ভিয়েনায় আমাদের হেডকোয়ার্টার রয়েছে। অস্ট্রিয়ান সরকারের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল...।’

‘তা হতে পারে, স্যার। কিন্তু, আমরা যতদূর জানি, আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।’

‘আপনি জোক করছেন, ইয়ংম্যান?’ হঠাৎ সতর্ক দেখাল ভাইস-প্রেসিডেন্টকে। ‘কে আপনি?’

‘আমার নাম মাইক হ্যালোরান। স্টেট ডিপার্টমেণ্টে প্রটোকল অফিসার হিসেবে আছি।’ পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে দেখাল রানা, ভেতরে সরকারি আই.ডি. রয়েছে, ওর ছবি সহ। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। মনে মনে প্রশংসা করল সে, লোকটার মনের ভাব বাইরে ফুটছে না। এমন কোন লক্ষণ নেই চেহারায় যা দেখে বোঝা যাবে রানার মত সে-ও ব্যাপারটা জানে। কিন্তু জানে যে সে-ব্যাপারে রানার কোন সন্দেহ নেই। সোয়ানটেক্স করপোরেশন সত্যি সত্যি অস্ট্রিয়ান সরকারের কিছু অফিসারকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়েছে। ঘটনা এই প্রথম নয়, অনেক বছর ধরেই ঘটছে। ঘুষের বিনিময়ে এক্সপোর্ট কোটা, আয়কর, জাহাজ চলাচল, এবং পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়ে অবৈধ কিছু সুবিধে ভোগ করছে এই করপোরেশন।

অল্প কিছুদিন হলো ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে অস্ট্রিয়ান সরকার। তদন্তের ভার দেয়া হয় নাম করা একটা আন্তর্জাতিক মানের ইনভেস্টিগেশন ফার্মকে। তদন্তের রিপোর্ট এখনও অস্ট্রিয়ান সরকারের হাতে পৌঁছায়নি, কাজেই সোয়ানটেক্সের বিরুদ্ধে এখুনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, অপরাধবোধ থাকায় রকি ডুরেলসন সাবধানে পা ফেলবে। সোমবারের আগে টেরই পাবে না যে তাকে বোকা বানানো হয়েছে।

‘এরকম নাজুক পরিস্থিতিতে,’ ওয়ালেট ফিরিয়ে নিয়ে পকেটে ভরতে ভরতে বলল রানা, ‘প্রটোকল অফিস ভাবছে, আজ রাতে সোয়ানটেক্সের তরফ থেকে হোয়াইট হাউসে কোন প্রতিনিধি না

পাঠানোই উচিত হবে।'

'আই সি! তারমানে অস্পষ্ট একটা অভিযোগ তুলে অফিশিয়ালি আমাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো, তাই কি? অভিযোগ কি প্রমাণিত হয়েছে, হ্যালোরান? জানতে পারি, অভিযোগটা কে করছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত, স্যার। আমরা একটা ফরেন গভর্নমেণ্টের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কাজ করছি। এর বেশি আপনাকে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

'ব্যাখ্যা নেই, অথচ হোয়াইট হাউসে যেতে নিষেধ করা হলো আমাকে... ।'

'ঠিক ওভাবে দেখবেন না, স্যার, প্লীজ। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত নয়। তবে আমার ধারণা, অবস্থা কি আপনি বুঝতে পারছেন, আপনি গেলে হয়তো...'

'ভদ্রভাবে ফিরিয়ে দেয়া হবে, এই তো?' প্রচণ্ড ক্ষোভে টাই ধরে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করল সে, খুলে ফেলে দিল ছুঁড়ে। 'বেরিয়ে যাও, হ্যালোরান! ফোনে জরুরী কথা বলতে হবে আমার!'

নিরীহ ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল রানা। স্টেট ডিপার্টমেণ্ট বা হোয়াইট হাউস, যেখানে খুশি ফোন করুক ডুরেলসন, শনিবার রাতে ডিউটি অফিসার ছাড়া কাউকে পাবে না সে। ডিউটি অফিসাররা সবাই এক বাক্যে জানাবে, এ-প্রসঙ্গে কিছুই তাদের জানা নেই। আর যদি চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে সময় নেয় ডুরেলসন, কোথাও খোঁজ নেয়ার চেষ্টাই করবে না সে। বেশিরভাগ সম্ভাবনা, পরবর্তী ফ্লাইটে ভিয়েনায় চলে যাবে।

সোয়া ঘণ্টা পর রকি ডুরেলসনের চেহারা, পরিচয়-পত্র, আর নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে হোয়াইট হাউসের ইস্ট গেট-এ হাজির হলো রানা। এমন সময় পৌঁছুল, যখন নিমন্ত্রিতরা বেশিরভাগই ভেতরে

ঢুকে গেছে। ভিড় ঠেলতে বা লাইন দিতে হলো না, ওর হাত থেকে এনগ্রেভ করা কার্ড নিয়ে চোখ বুলাল গার্ড, খাতায় লেখা রকি ডুরেলসনের নামের পাশে একটা টিক চিহ্ন দিল। কার্ড ফেরত নিয়ে এগোল রানা, ঢুকে পড়ল ইস্ট উইং-এ। এখানে সামরিক পোশাক পরা একটা মেয়ে কার্ডটা নিয়ে আর ফেরত দিল না। 'হ্যাভ এ নাইস ইভনিং, মি. ডুরেলসন,' উজ্জ্বল হেসে বলল মেয়েটা।

'থাঙ্ক ইউ, আই য়্যাম শিওর আই উইল।'

প্রশস্ত একটা হলঘরে ঢুকল রানা, জানালার বাইরে জ্যাকুলিন কেনেডি গার্ডেন। ক্লোকরুমকে পাশ কাটিয়ে চলে এল ম্যানসনের প্রধান অংশে। এখানে কার্পেট মোড়া করিডরে মৃদু আলো জ্বলছে, দু'দিকের দেয়ালে সার সার পোর্ট্রেট ঝুলছে বর্তমান ফার্স্ট লেডির। লোকজন রয়েছে, কিন্তু খুব বেশি নয়—কয়েকজন মাত্র অতিথি, ইউনিফর্ম পরা আরও অনেক সোশিয়াল এইডস, গাঢ় রঙের স্যুট পরা দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট—বুকের কাছে কোটের ভাঁজে লাল পিন লাগানো।

হোয়াইট হাউসে এর আগে কখনও আসেনি রানা। ফ্লোর প্ল্যান দেখেছে, লোকমুখে শুনেছে কোথায় কি আছে না আছে। একজন ইউনিফর্ম পরা লোকের পাশে দাঁড়াল ও, জিজ্ঞেস করল, 'মেন'স রুম কোন্ দিকে, প্লীজ?'

'লাইব্রেরির ভেতর দিয়ে, স্যার, আপনার ডান দিকে।'

লাইব্রেরিতে ঢুকে চারদিকে ভাল করে দেখল রানা। দরজা আর জানালা বাদ দিয়ে দেয়ালের প্রতি ইঞ্চি কাঁচ-ঢাকা র্যাকে শুধু বই আর বই। অগ্নিকুণ্ডে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। কামরাটা তৈরিই করা হয়েছে আগুনের ধারে বসে গল্প-গুজব বা আলোচনা চালাবার জন্যে, যে-সব গল্প-গুজব বা আলোচনা ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেতে পারে। বিশাল কামরা জুড়ে এত দামী দামী

ফার্নিচার, এখানে বসে কেউ পড়ায় মন বসাতে পারবে কিনা সন্দেহ হলো রানার। লাইব্রেরিতে ও একা। মেন'স রূমে ঢোকার পথ পুব দেয়ালে, চারজন ইণ্ডিয়ান চীফ-এর পোর্ট্রেট ঘেঁষে যেতে হয়। সবুজ একটা দরজা, পিতলের চকচকে হরফে লেখা: জেন্টলমেন।

কয়েক মিনিট পর আবার বেরিয়ে এল রানা, ইউনিফর্ম পরা এইডের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। লাল কার্পেটে মোড়া সিঁড়ির ধাপ, সোনালি রেইলিং, ম্যানসনের স্টেট লেভেলে উঠে এল ও। ঢুকল সোনালি আর সাদায় ঝলমলে ইস্ট রূম-এ। আরও ঝলমলে পোশাক পরা নিমন্ত্রিত নারী-পুরুষ দলে দলে নাচছে, হাঁটাহাঁটি করছে, গল্প করছে। সবার মাথার ওপর থমথমে চেহারা নিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন আর জন কুয়েন্সি অ্যাডামস। সব মিলিয়ে কয়েক শো-র কম নয়—পুরুষরা প্রায় সবাই কালো টাই পরেছে, ফুলে থাকা গাউন পরেছে মেয়েরা। এদের মধ্যে রয়েছে কংগ্রেস সদস্য, ক্যাবিনেট অফিসার, বিদেশী কূটনীতিক, প্রখ্যাত জার্নালিস্ট, আর হোমরাচোমরা হোয়াইট হাউস স্টাফ। মুখ তুলে মার্থা ওয়াশিংটনের একটা পেইন্টিঙের দিকে তাকাল রানা, স্বামীর চেয়ে কম গম্ভীর নন।

একজন ওয়েটার পাশ ঘেঁষে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে গ্লাসে স্কচ নিল রানা। পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে মোটেও কোন অসুবিধে হলো না ওর। ভদ্রতাবোধ যেখানে দাবি করে সেখানে থেমে মাথা ঝাঁকাল কখনও, কখনও মৃদু হাসল, বিখ্যাত কারও সামনে পড়ে গেলে কুশল জানতে চাইল। সুবিধে হলো, ওকে কেউ চেনে না, কিন্তু ও অনেককে চেনে। নিয়মিত টাইম আর নিউজউইক পড়ায় এই একটা লাভ হয়েছে।

বেশিক্ষণ কোথাও দাঁড়াল না রানা। প্রায় সারাক্ষণ ঘোরার মধ্যে থাকল ও। ওয়াশিংটন এমন একটা শহর যেখানে

বহিরাগতদের নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। পরিচয় নেই, কাজেই কেউ রানার দিকে মনোযোগ দিল না। কয়েকটা দলের পাশ ঘেঁষে গেল রানা, দু'একটা দলের ভেতর ঢুকে আলোচনায় অংশ নিল–বুঝল, এদের সাথে মেলামেশা না থাকলে পাত্তা পাওয়া অসম্ভব। কেউ কোম্পানি বা করপোরেশনের পুরো নাম উচ্চারণ করে না, ইনিশিয়াল দিয়ে কাজ সারে। প্রখ্যাত কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ডাকনাম ব্যবহার করা হয়।

সরে এল রানা। একা হয়ে পড়ল। এরপর ওর একমাত্র কাজ হলো, সোশিয়াল এইডদের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকা। ওদের দায়িত্বের একটা অংশ হলো, কেউ যেন নিঃসঙ্গ বোধ না করে।

গ্রীন রূম থেকে ব্লু রূমে, সেখান থেকে রেড রূমে এল রানা। পেইন্টিং-এর সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সাথে আলাপ করা অনেকটা নিরাপদ, কমবেশি সবাই তারা শিল্প বোঝে, অন্য কোন ব্যাপারে আগ্রহী নয়। প্রচুর অ্যান্টিকস দেখল রানা, সাধারণ অতিথিদের ছোঁয়া বারণ। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে এল স্টেট ডাইনিং রূমে। বড়সড় একটা ভিড় জমে উঠেছে লম্বা বুফে টেবিলের সামনে। আরেকটা ভিড় বার-কে ঘিরে। ডাইনিং রূমটা এতই বড় যে আরেক ধারে কয়েকশো লোকের লম্বা একটা লাইন থাকা সত্ত্বেও প্রচুর জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ক্রস হলে যাবে ওরা, রিসিভিং লাইনে প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের সাথে হ্যাণ্ডশেক করবে। ক্রস রূম থেকে স্টেট রূমে যাওয়া যায়।

গ্লাসটা আবার ভরার জন্যে বারের সামনে থামল রানা। তারপর লাইনে দাঁড়াল। শুধু প্রেসিডেন্ট বা ফার্স্ট লেডির সাথে নয়, প্রেসিডেন্টের সম্মানিত একজন মেহমানের সাথেও হ্যাণ্ডশেক করবে ও।

*

রিসিভিং লাইনে দশ মিনিট হলো দাঁড়িয়ে আছেন পামেলা কনওয়ে। ক্লান্ত, অসুস্থ বোধ করলেন তিনি। মনে হলো, আরও দশ মিনিট এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে তিনি জ্ঞান হারাবেন। আজ বলে কথা নয়, তাঁর জীবনে ভয়ানক একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে বলেও নয়, রিসিভিং লাইনে দাঁড়াতে চিরকালই খারাপ লাগে তাঁর। প্রতিটি মানুষের জন্যে দু'সেকেণ্ডের বেশি সময় দেয়া সম্ভব নয়, এই দু'সেকেণ্ডে একবার করে মানুষ হাসে কি করে?

না, আজ সম্ভব নয়। সিদ্ধান্ত নিয়ে পামেলা কনওয়ে পালিয়ে চলে এলেন ওপরতলায়। নিজস্ব পারিবারিক, ঘরোয়া পরিবেশে ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

সি.আই.এ. চীফের স্ত্রী মার্গারেট তাঁকে টিউলিপের শোবার ঘরে এসে খুঁজে পেল। পামেলা কনওয়ের চোখ শুকনো, নিঃসাড় দাঁড়িয়ে আছেন, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে মেয়ের নিভাঁজ বিছানার ওপর। টিউলিপ মিশিগানে যাবার আগে সাজানো হয়েছে বিছানাটা।

দোরগোড়ায় দাঁড়াল মার্গারেট। 'পামেলা?'

ফার্স্ট লেডি মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখে যেমন ঘোর লাগা দৃষ্টি, কণ্ঠস্বরও তেমনি ভোঁতা শোনাল। 'হাই, মার্গারেট। ভেতরে এসো।'

'এখানে তুমি কি করছ?' ঘরে ঢুকে এগিয়ে এল মার্গারেট, একটা হাত রাখল বান্ধবীর কাঁধে। 'এখানে তো তোমার থাকার কথা নয়।'

'জানি নেই, তবু বারবার শুধু মনে হচ্ছিল এখানে এলে ওকে হয়তো দেখতে পাব।'

দরদমাখা হাসি দেখা গেল মার্গারেটের ঠোঁটে, কিন্তু দৃঢ় ভাবটুকু বজায় থাকল চেহারায়। 'এসো, আমার সাথে এসো।

নিজেকে এভাবে কষ্ট দেয়ার কোন মানে হয় না।'

'জানি।' পাশের ঘরে যাবার বন্ধ দরজার দিকে তাকালেন পামেলা। 'মিসেস কেনটারকিও হলরুমে থাকতে চেয়েছে, এখানে আসতে তার খারাপ লাগে।'

'কেমন আছে মিসেস কেনটারকি?'

'শরীর ভাল। কিন্তু সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে।' চোখ বুজলেন পামেলা। 'মার্গারেট, দোষ তো আসলে আমার... ।'

'কি ছাই বকছ! তোমার দোষ হতে যাবে কি জন্যে?'

'আমি যদি মেক্সিকোয় না যেতাম, আমরা যদি টিউলিপকে মিশিগানে না পাঠাতাম... ।'

'অন্য কোনভাবে কাজটা ওরা ঠিকই করত।'

'হয়তো করত না, হয়তো করার সুযোগ পেত না, কিংবা হয়তো করতে গিয়ে পারত না... ।'

মাথা নাড়ল মার্গারেট। 'প্রফেশনালদের এত সহজ ভেবো না, বুঝলে! সুযোগ ওদের পেতে হয় না, সুযোগ তৈরি করে নেয়। জেফের সাথে থেকে এটুকু অন্তত জেনেছি।'

পামেলা মেনে নিতে পারলেন না। সামনের দিকে ঝুঁকে বালিশের পাশ থেকে একটা পুতুল তুলে নিলেন, হাত দিয়ে ঠিক করে দিলেন কালো চুল। 'বলতে পারো, কি করব আমি?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, যেন নিজের সাথে কথা বলছেন। 'ছবি আঁকতে পারি না, চিঠি পড়তে পারি না... ।'

বান্ধবীকে আরও শক্ত করে ধরল মার্গারেট। 'কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ, আমি জানি, ভাই। হায় ঈশ্বর, এর চেয়ে খারাপ কিছু কল্পনা করা যায় না। কিন্তু, পামেলা, এ-ও সত্যি যে টিউলিপকে ওরা ঠিকই ফিরিয়ে আনবে। এই মুহূর্তে হাজার হাজার লোক হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে। জানো, সেই থেকে জেফকে আমি

বলতে গেলে দেখিইনি...'

'কিন্তু মার্গারেট, দু'দিন হয়ে গেল! এখনও ওরা কোন সূত্রই পায়নি... ।' নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না, বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন পামেলা কনওয়ে। 'কি চায় ওরা? বলে না কেন কি চায়! টিউলিপের জন্যে সব দিতে পারি আমি, স-ব... ।'

পুতুলটাকে বুকে চেপে ধরে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লেন ফার্স্ট লেডি।

কয়েকশো লোকের লাইনে রানাও একজন। সম্ভবত নামটা ছাড়া আর কিছু না শুনেই প্রেসিডেন্ট ওর সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন। কিংবা হয়তো তাও শোনেননি।

'আপনি আসতে পেরেছেন সেজন্যে আমি খুশি,' বললেন তিনি। 'ওহো, ওস্তাদের সাথে পরিচয় হয়েছে কি?'

পাশে দাঁড়ানো পক্বকেশ বৃদ্ধের দিকে তাকাল রানা, ইতোমধ্যে লাইনের পরবর্তী লোকের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

প্রখ্যাত বেহালাবাদকের চোখে চোখ রেখে হাসল রানা। 'আমার সৌভাগ্য, হের ভ্যানডেরবার্গ। আপনার সঙ্গীতের আমি একজন নগণ্য শ্রোতা–অনেক বছর ধরে।'

হাতের ছড়ি নেড়ে মৃদু হাসল ওস্তাদ বেহালাবাদক। 'ধন্যবাদ। শুনে খুশি হলাম।'

'সম্ভবত আমার এক বন্ধুকে আপনিও চেনেন,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'ইয়েস?'

'অ্যানা দিয়েত্রিচ।'

এক মুহূর্ত রানার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকল ভ্যানডেরবার্গ।

পরমুহূর্তে তার চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটে উঠল। কেউ যেন বোতাম টিপে দিয়েছে, আচমকা ঘামতে শুরু করল সে। ব্যস্ত, কাঁপা হাতে রুমাল বের করে কপাল আর মুখ মুছল ওস্তাদ।

'আমরা সম্ভবত পরে এক সময় কথা বলব।'

'হ্যাঁ, কথা বলার দরকার হবে।'

ছোট্ট করে, সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ইস্ট রূমে চলে গেল ও। অটল দাঁড়িয়ে আছে হফ ভ্যানডেরবার্গ–বরাবরের মত ঋজু ভঙ্গি, চোখ দুটো ঠাণ্ডা, চেহারায় রাজ্যের অহমিকা। সরাসরি এমনভাবে তাকিয়ে আছে, রানা যেন একটা নর্দমার কীট।

'অ্যানা দিয়েত্রিচ,' বলল রানা। 'নাৎসী বাহিনীর সাথে আপনার যোগাযোগের মাধ্যম।'

কামরায় আর কেউ নেই। বাইরে লাল কার্পেট মোড়া করিডরে সিকিউরিটি এজেন্ট আর মিলিটারি এইডরা রয়েছে, একটু জোরে ডাকলেই ছুটে আসবে। তবে ওরা কেউ লাইব্রেরি রূমের দিকে এই মুহূর্তে তাকিয়ে নেই।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল ভ্যানডেরবার্গ।

রানা নিরুত্তর।

'ইসরায়েলী?'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল রানা। 'না, তবে আপনার কথা জানলে ধেই ধেই করে নাচবে ওরা। আপনার চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ লোকের জন্যে দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে।'

ভ্যানডেরবার্গের চেহারায় ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'ইসরায়েলী যদি না হন, কে আপনি? আর কার মাথাব্যথা থাকতে পারে?'

'ইসরায়েল ছাড়াও পাইকারী হত্যা অনুমোদন করে না এমন দেশ অনেক আছে,' বলল রানা। 'তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, হাটে

আমি হাঁড়ি ভাঙছি না। কাউকে কিছু বলার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

ভ্যানডেরবার্গের চেহারায় সন্দেহের ছায়া পড়ল। 'আপনার কি ধারণা, আপনাকে আমি ভয় পাই?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'লোকে আপনাকে বিশ্বাস করবে, নাকি আমাকে?'

'অত দূর ব্যাপারটা গড়াবে বলে মনে করি না আমি।'

'কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে? অ্যানা বার্লিনে মারা গেছে। আর সবাইও কেউ বেঁচে নেই।'

'এতটা বিশ্বাস করা বোকামি।' সবজান্তার হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'কেউ না কেউ ঠিকই বেঁচে থাকে। কেন, আমার চেয়ে ভাল জানেন আপনি, এমনকি নাৎসী ডেথ ক্যাম্পেও কিছু লোক বেঁচে গিয়েছিল, তাই না?'

মুখ ঘুরিয়ে নিল ভ্যানডেরবার্গ। বিরক্তি বা রাগে নয়, ঘৃণায়। আগুনের পাশে একটা চেয়ারে বসল সে, ঠাণ্ডা শ্বাপদের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। টান টান হয়ে আছে পেশী, শিরদাঁড়া খাড়া। পঁয়তাল্লিশ, কি তারও বেশি বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু নাৎসী স্বভাব আজও রয়ে গেছে লোকটার মধ্যে।

তার জন্যে কিছুই বদলায়নি।

'আপনি কি জানেন বলে ধারণা করেন? আমার হয়তো শোনার আগ্রহ থাকতে পারে।'

রানা দাঁড়িয়েই থাকল। লোকটার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে সিগারেট ধরাল ও। 'উনিশশো আটত্রিশ সাল,' শুরু করল ও। 'আপনি তখন তরুণ একজন বেহালাবাদক, দ্রুত নাম কিনছেন, অ্যানা দিয়েত্রিচ আপনার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। অ্যানা ছিল জার্মান। নাৎসী বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করে নিল, সেই সাথে পাসপোর্ট বাতিল করার অভিযান শুরু হয়ে গেল।'

ভ্যানডেরবার্গের চোখ জোড়া ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে। 'এ সব ইতিহাস। আমার, আর থার্ড রাইখের। সবারই জানা আছে।'

'সব কথা সবার জানা নেই,' বলল রানা। 'ঊনচল্লিশ সালের শুরুতে আপনার সাথে গোপনে অ্যানার দেখা হয়েছিল, জানে কেউ? নিজের পাসপোর্ট রক্ষা করার জন্যে এক কথায় অ্যানার শর্তে রাজি হয়ে গেলেন আপনি, জানে কেউ? ভিয়েনার শিল্পী মহলে আপনার যারা বন্ধু-বান্ধব ছিল, তাদের পরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি নাৎসীদের হাতে তুলে দিলেন আপনি, কেউ জানে?'

'বন্ধু-বান্ধব? ওরা কেন আমার বন্ধু-বান্ধব হতে যাবে? ওরা তো ইহুদি ছিল!' চাপা স্বরে প্রতিবাদ জানাল ভ্যানডেরবার্গ। হুঁশ জ্ঞান বোধহয় হারাতে শুরু করেছে সে।

সত্যি, তার জন্যে কিছুই বদলায়নি।

'হ্যাঁ, ইহুদি ছিল ওরা,' বলল রানা। 'আত্মগোপন করে ছিল। একটা-দুটো নয়, অনেকগুলো পরিবার। সবগুলোর হদিশ আপনি ফাঁস করে দিলেন। কত, আপনার মনে আছে?'

'কম বা বেশি, কি আসে যায়!'

'এখন আর তেমন কিছু আসে যায় না।'

'তখনও কিছু আসে যায়নি।'

'না। হাজার হাজার ইহুদি ধরা পড়ছিল, তার মধ্যে দু'চারটে পরিবারকে কে ধরিয়ে দিল না দিল কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যায়। কেউ জানল না, আপনি নাৎসী না হয়েও নাৎসীদের সাহায্য করলেন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের ঠেলে দিলেন মৃত্যুর মুখে। আসলে, মনে প্রাণে আপনি বরাবরই নাৎসী ছিলেন, বাইরে সেটা প্রকাশ করেননি, এই যা।'

'নাৎসীদের আদর্শে আমার বিশ্বাস ছিল,' এমন সুরে কথাটা বলল ভ্যানডেরবার্গ, যেন কোন ছাত্রের ভুল সংশোধন করে দিচ্ছে। 'নাৎসীরা নিজেরাও মানুষ হিসেবে নিকৃষ্ট ছিল। মৌলিক

অনেক গুণের অভাব ছিল তাদের মধ্যে। আরও যোগ্য লোক পাওয়া গেলে আদর্শটা বাস্তবায়িত হত।' হাত নেড়ে আক্ষেপ প্রকাশ করল সে। 'নাৎসীরা নেই। তবে, হ্যাঁ, আদর্শ কখনও মরে না–আদর্শ আছে, থাকবে। কিন্তু, আপনি? আপনি কে? এত কথা জানলেন কিভাবে? কে আপনাকে বলতে পারে! ত্রিশ বছরের বেশি হলো মারা গেছে অ্যানা।'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রানা বলল, 'অ্যানা দু'বছর আগে মারা গেছে। আত্মহত্যা। বার্লিনে নয়, ব্রাজিলে। মারা যাবার আগে এটা সই করে গেছে সে।' কোটের পকেট থেকে ভাঁজ করা কিছু কাগজ বের করল ও।

ভ্যানডেরবার্গ অপেক্ষা করল, কিন্তু রানা এগিয়ে এল না। অগত্যা চেয়ার ছাড়তে হলো ভ্যানডেরবার্গকে। মন দিয়ে পড়ার দরকার হলো না, চোখ বুলিয়েই যা বোঝার বুঝে নিল সে। ধীরে ধীরে মুখ তুলল রানার দিকে, চোখ জোড়া এখন আর ঠাণ্ডা নয়। ধিকি ধিকি জ্বলছে। 'কি চান আপনি?'

'নাৎসীরা যা চেয়েছিল,' বলল রানা। 'আপনার সহযোগিতা।'

দ্রুত দরজার দিকে তাকাল রানা। বাইরের হলে অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠের গমগমে গুঞ্জন শোনা গেল। হলে ঢুকে আবার করিডরে বেরিয়ে এল তারা, অতিথিদের কয়েকটা দল একটু তাড়াতাড়ি বিদায় নিচ্ছে। 'ইচ্ছে করলে আপনি চিৎকার করে লোক জড়ো করতে পারেন, ভ্যানডেরবার্গ। অথবা আমার সাথে আসতে পারেন।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ভ্যানডেরবার্গ। হাতের কাগজগুলোর দিকে একবার তাকাল। তারপর নিঃশব্দে রানাকে অনুসরণ করল সে, সবুজ দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা সিটিং রূমে। এখানে বিশাল একটা আয়না রয়েছে, দেয়াল জুড়ে বইয়ের র‍্যাক। সোজা বাথরূমের দিকে এগোল রানা।

মোজাইক করা মেঝে থেকে সিলিঙের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভ্যানডেরবার্গকে হঠাৎ করে ছোটখাট দেখাল। শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেছে তার, চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি। রানা জানে, নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে। সম্মানীয় ওস্তাদকে এরই মধ্যে হয়তো খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে। দোতলা থেকে নির্দেশ পেয়ে যে-কোন মুহূর্তে সোশিয়াল এইড আর সিকিউরিটি এজেন্টরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

পকেটে হাত ভরে ঝরনা কলমটা বের করল রানা। ক্যাপ খুলে কলমটা উল্টো করে ধরল।

সিরিঞ্জের সূঁচটা দেখল ভ্যানডেরবার্গ। ধীরে ধীরে তার চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। তিক্ত একটু হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। রানার দিকে তাকাল সে। চেহারায় ঘৃণা, আর চোখের দৃষ্টিতে পরাজয় না মানার জেদ। 'কি করতে চান?'

'আমি?' রানা হাসল। 'আমি কেন কিছু করতে যাব?' কলমটা ভ্যানডেরবার্গের দিকে বাড়িয়ে দিল ও। 'ইচ্ছে করলে এটা নিতে পারেন আপনি। অথবা আমার সাথে বেরিয়ে যেতে পারেন।'

'থানায়?'

রানা কোন উত্তর দিল না।

তিক্ত হাসিটুকুও ভ্যানডেরবার্গের ঠোঁট থেকে মিলিয়ে গেল। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। 'সোয়াইন! অনার্য পশু! ঠিক আছে, জীবন দিয়েই আমি প্রমাণ করে যাব নাৎসী আদর্শের মৃত্যু নেই।' প্রায় ছোঁ দিয়ে রানার হাত থেকে কলমটা কেড়ে নিল সে। হ্যাঁচকা টানে শার্টের আস্তিন ওপর দিকে তুলে দিয়ে বাহুতে সিরিঞ্জের সূঁচ ঠেকাল, রানার ওপর স্থির হয়ে থাকল দৃষ্টি। সূঁচটা চামড়া ভেদ করে ঢুকে গেল ভেতরে, মুখের এক বিন্দু চামড়া কোঁচকাল না।

কোন প্রতিবাদ না, আক্ষেপ না, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি না, বুক

ফুলিয়ে মারা গেল লোকটা। টলে পড়ে যাচ্ছিল, রানা তাকে ধরে ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল বাথরুমের মেঝেতে।

বারো

ধনুকের মত বাঁক ঘুরে কুয়াশা ঢাকা মেমোরিয়াল ব্রিজ পেরোল ডানিয়েল, পিছনে ফেলে এল লিংকন মেমোরিয়াল। ব্রিজ পেরিয়ে এসে লোয়ার হেডলাইট জ্বেলে দিল সে, দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন পার্কওয়েতে গাড়ি তুলল। মাত্র দু'একটা গাড়ি রয়েছে রাস্তায়। ভোর, পাঁচটা এখনও বাজেনি।

পার্কওয়ে ধরে এক দেড় মাইল এগোবার পর বাদামী আর সাদা সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ল, ডান দিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল গাড়ি। গাছপালার ভেতর দিয়ে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে চওড়া ফুটপাথে ঘেরা একটা পার্কিং লটে। গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল ডানিয়েল, নেমে পড়ল।

লটে আর কোন গাড়ি নেই, চারদিকে নিস্তব্ধতা আর কুয়াশা। সরু একটা পথ ধরে এগোল ডানিয়েল, কাঁকর ছড়ানো। পথের দু'পাশে সার সার পাইন গাছ। গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে সামনে দেখা গেল বিশাল একটা পাথুরে কাঠামো। এল.বি.জে. মেমোরিয়াল গ্রোভ।

পাথরের তৈরি একটা বেঞ্চে অপেক্ষা করছিল কর্নেল অবসন। তারপাশে, মাঝখানে একটু দুরত্ব রেখে, বসল ডানিয়েল।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রানার সাথে যোগাযোগ করো,' বলল

অবসন। 'কি করছে, কখন করছে, সব আমি জানতে চাই।'

ডানিয়েল গম্ভীর হয়ে গেল। 'এটা সে পছন্দ করবে না, স্যার।'

'জানি,' প্রায় ধমকের সুরে বলল অবসন। 'কিন্তু তার পছন্দ না হলেও আমাকে সব জানতে হবে। তাকে বলো, প্ল্যান প্রোগ্রাম নিজেই সে করতে পারবে, কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে আগেই ধারণা দিতে হবে আমাকে। তোমার মাধ্যমে।'

সিগারেট ধরাল ডানিয়েল। 'এ-সব কথা এখন বলে কোন লাভ আছে? বোধহয় দেরি হয়ে গেছে।'

অবসনের চেহারায় উদ্বেগের ছায়া পড়ল।

দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা আঙুলের টোকা দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল ডানিয়েল। 'এই মাত্র রানার কাছ থেকে এলাম আমি,' বলল সে। 'আপনি জানেন, কাল রাতে হোয়াইট হাউসে গিয়েছিল ও?'

'রানা? হোয়াইট হাউসে?'

মাথা ঝাঁকাল ডানিয়েল।

'আশ্চর্য! ম্যানেজ করল কিভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডানিয়েল। 'আর সব যেভাবে ম্যানেজ করে। আমার ধারণা, অন্য কারও ভূমিকা পালন করছিল। মেহমানদের একটা তালিকা চায় সে, যোগাড় করে দিই। সে যাই হোক, ওখানে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। হফ ভ্যানডেরবার্গ মারা গেছেন।'

চেহারায় উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে অবসন।

'হার্ট অ্যাটাক,' আবার বলল ডানিয়েল, অবসনের পেশীতে ঢিল পড়ল একটু। 'নাকি বলা উচিত সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক?'

অবসনের চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। 'তুমি কি বলতে চাইছ, হফ ভ্যানডেরবার্গকে খুন করেছে রানা?'

'আমার তাই ধারণা।'

‘হোয়াইট হাউসে?’

‘একেবারে প্রেসিডেন্টের নাকের ডগায়।’

একেবারে বোবা বনে গেল অবসন। স্থির বসে থাকল সে, শুধু চোখ দুটো অস্থির। তারপরই সে বিস্ফোরিত হলো, ‘ক্রাইস্ট অলমাইটি, এ আমি কোন্ পাগলের পাল্লায় পড়লাম!’

‘পাগল? মাসুদ রানা?’ এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ডানিয়েল। ‘আমার তা মনে হয় না। আরও কি ঘটে দেখুন, তারপর বলবেন!’

সকালের হালকা কুয়াশা কেটে যাবার পর ওয়াশিংটন থেকে ট্রেনে চড়ল রানা, গন্তব্য নিউ ইয়র্ক। কাগজ-পত্রে ওর পরিচয়, ফ্রেঞ্চ অ্যান্টিক ডিলার। নিউ ইয়র্কে পৌঁছে আবার একবার পরিচয় বদল করবে—অস্ট্রিয়ান ব্যবসায়ী, বাড়ির পথে ভিয়েনার ফ্লাইটে আরোহী।

সকালের কাগজে হফ ভ্যানডেরবার্গের মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছে। টাইমস খবরটা গাম্ভীর্যের ভাব নিয়ে ছেপেছে, কিন্তু নিউজ উইক বিয়োগান্ত কাব্য রচনা করার এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ একজন মানুষ, বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে মানুষের শ্রদ্ধা আর সম্মান কুড়োচ্ছিলেন, তারপর সকলের অগোচরে, নিভৃতে-নির্জন বাথরূমে ঢুকে বিদায় নিলেন—তাও আবার হোয়াইট হাউসে, ফর গডস সেক!

আসল কথাটা যদি জানত রে!—ভাবল রানা। ছোঁয়া যেত না, আগুন হয়ে উঠত কাগজগুলো।

কাগজে আরও খবর দেখল রানা। এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালা শিল্পীর এ-ধরনের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে হোয়াইট হাউস থেকে। ওস্তাদকে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে সামরিক পরিবহনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন

প্রেসিডেন্ট। মিলিটারি জেট এনড্রু এয়ারফোর্স বেস থেকে টেক-অফ করবে, রানার কমার্শিয়াল ফ্লাইট জে.এফ.কে. এয়ারপোর্ট থেকে টেক-অফ করার খানিক পর।

প্রেসিডেন্ট একটা অফিশিয়াল কমিটি গঠন করেছেন, ভ্যানডেরবার্গকে এসকর্ট করে দেশে নিয়ে যাবে তারা। কমিটির সদস্য হলেন অস্ট্রিয়ায় আমেরিকার প্রাক্তন দূত, বিখ্যাত একজন আমেরিকান বেহালাবাদক, এবং প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত অপর এক ব্যক্তি, যিনি সেক্রেটারি অভ স্টেটস-এর সমান পদমর্যাদা সম্পন্ন হবেন।

জেটে আরও একজন বিশিষ্ট আরোহী থাকবে, আপনমনে হাসতে হাসতে ভাবল রানা। ছোট, কিন্তু বিশিষ্ট, আর সব আরোহীদের চেয়ে যার গুরুত্ব অনেক বেশি।

আজ সারাটা দিন শুধু বারবার হফ ভ্যানডেরবার্গের কথা ভাবছেন জেফ রিকার্ড। সরকারি দায়িত্বের প্রেক্ষিতে বিচার করলে, ব্যাপারটা তাঁর জন্যে কোন উদ্বেগের বিষয় নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছেন তিনি। কারণটা কি জানা নেই। সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। অথবা সময়ের তাৎপর্য...।

সময়! ওহ্ গড!

সামনের দিকে ঝুঁকে একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি।

'ইয়েস, স্যার?'

ইন্টারকমে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন রিকার্ড, 'লাইনে হোয়াইট হাউস ফিজিশিয়ানকে চাই। পিকেরিংকে বলো, এই মুহূর্তে আমার সাথে দেখা করতে হবে।'

ফোনে কথা বলছেন সি.আই.এ. চীফ, দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল পিকেরিং, রীতিমত হাঁপাচ্ছে। ওঅর রূমে ছিল সে, এলিভেটরের জন্যে দেরি না করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছে।

চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

'সম্ভব তাহলে, কেমন?' রিকার্ড বললেন। 'ধন্যবাদ, ডাক্তার। এটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ডেপুটির দিকে ফিরলেন তিনি। চশমার ভেতর চোখে উত্তেজনার ঝিলিক। 'তোমাকে একটা থিওরি দিই, পিকেরিং। আমার ধারণা, ভ্যানডেরবার্গকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন করা হয়েছে!' হাঁ হয়ে গেল পিকেরিং। 'কিন্তু কেন?'

'মিলিটারি ট্রান্সপোর্টের সুবিধে কাজে লাগাবার জন্যে। সবাই জানে, কাস্টমস মিলিটারি ট্র্যান্সপোর্ট সার্চ করে না।'

'ও মাই গড!' পিকেরিং মাথায় হাত দিল।

পিকেরিং কখন মাথা থেকে হাত নামাবে, সে অপেক্ষায় বসে থাকলেন না রিকার্ড। 'আমাদের ভিয়েনা স্টেশন চীফকে সতর্ক করে দাও, ইমিডিয়েটলি,' নির্দেশ দিলেন তিনি। 'তাকে বলো, সব কাজ ফেলে সমস্ত মনোযোগ এই কাজে ঢালতে হবে। অস্ট্রিয়ার প্রপার অফিশিয়াল এবং প্রতিবেশি দেশগুলোকেও অ্যালার্ট করে দাও। সমস্ত কিছু যেন কাভার করা হয়–এয়ারপোর্ট, রেলরোড স্টেশন, সীমান্ত–প্রতিটি ফাঁকের প্রতিটি ইঞ্চি।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে সটান উঠে দাঁড়াল পিকেরিং। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল সে। 'স্যার, আমাকে যেতে দিন।'

'ভিয়েনা তোমাকে আমি কি করে পাঠাই! তোমাকে আমার এখানে দরকার।'

'এখানের চেয়ে ওখানেই আমাকে বেশি দরকার আপনার, স্যার। আমরা যে সূত্রটা খুঁজছি, এবার হয়তো পেয়ে যাব ওখানে। এত বড় একটা দায়িত্ব একজন স্টেশন চীফকে দিয়ে বসে থাকা উচিত হবে না। তা সে যত যোগ্যই হোক না কেন।'

জেফ রিকার্ড ইতস্তত করতে লাগলেন। তারপর, সিদ্ধান্ত

নিয়ে, একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি। 'এনড্রু-র সাথে যোগযোগ করো,' ইন্টারকমে নির্দেশ দিলেন। 'ত্রিশ মিনিটের মধ্যে একটা প্লেন রেডি করতে হবে, ভিয়েনায় যাবে। একটা হেলিকপ্টারকেও স্টার্ট নিতে বলো।'

'আপনার জন্যে, স্যার?'

'না, হেনরি পিকেরিঙের জন্যে।'

শহরে সন্ধ্যা নামছে। ভিয়েনার সোয়েস্যাত এয়ারপোর্টের চারদিকে যানবাহনের অসম্ভব ভিড়। আস্তে-ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে ডানিয়েল, দুর্ঘটনার ঝুঁকি নেয়ার সময় নয় এটা।

এয়ারপোর্টের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ একটা গাড়ি-পথের দিকে বাঁক নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। উপযুক্ত কাগজ-পত্র ছাড়া যে-কেউ এখানে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে পারে না। ভেতরে ঢুকে গাড়ি একবার মুহূর্তের জন্যে থামাল সে, সশস্ত্র গার্ডকে কার্ড দেখাল।

কংক্রিট অ্যাপ্রনে দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকান জেট, টার্মিনাল থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে। টারমাকে বেশ কিছু লোক রয়েছে, তাদের কাছাকাছি গাড়ি থামাল ডানিয়েল। নিচে নেমে শবযানের দরজা খুলল।

এরপর পিছিয়ে এল ডানিয়েল, অপেক্ষা করতে হবে তাকে। ভাঁজ খুলতে খুলতে প্লেনের পেটের কাছে উঠে গেল ব্যাগেজ লিফট। আরোহীরা নামতে শুরু করল, ওদিকে চারজন ইউনিফর্ম পরা লোক ধরাধরি করে কফিনটাকে তুলে দিল লিফটে। কফিনের সাথেই নেমে এল তারা। কফিনটা বয়ে নিয়ে এল শবযানের কাছে।

ব্যাগেজ কর্মীরা আর যাই হোক, গোয়েন্দা নয়। এর আগে ওদের কেউ যদি কোন শবযানের ভেতরটা দেখেও থাকে,

খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু তাদের মনে থাকার কথা নয়। মেঝেতে একটা ফাঁক আছে বটে, কিন্তু জানা কথা গাড়ির ঝাঁকিতে ভারী কফিনটা যাতে উল্টে বা কাত হয়ে না পড়ে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

পিছনের দরজা বন্ধ করল ডানিয়েল, হুইলের পিছনে উঠে বসল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে পুলিস এসকর্টের পিছু নিল সে। ড্যাশবোর্ডের তলায় একটা বোতাম রয়েছে, হাত বাড়িয়ে চাপ দিল সেটায়। তার পিছনে খুলে গেল তালাগুলো। কফিন আর তার নিচে আলাদা কমপার্টমেন্ট এখন আর পরস্পরের সাথে সংযুক্ত নয়।

এসকর্ট কারের পিছু পিছু ভিয়েনার রাস্তা ধরে এগোল শবযান। গন্তব্য শহরের মাঝখানে একটা সরকারী শবাগার। জায়গাটা দানিয়ূব নদী আর স্টিফেন'স ক্যাথেড্রালের কাছাকাছি। কফিনটা যখন তোলা হলো, ডানিয়েল ছাড়া আর কেউ লক্ষ করল না যে আগের সেই ফাঁকটা আর নেই। শবযান এখন সম্পূর্ণ সমতল।

সিঁড়ি বেয়ে কফিনটাকে তুলে নিয়ে গেল লোক চারজন, আর সবার সাথে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল ডানিয়েল। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সরে এল সে, কেউ তেমন খেয়াল করল না। খানিক পর বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে শিল্প এলাকায় ঢুকল গাড়ি। আরও দশ মিনিট পর ডান দিকে গ্যারেজটা দেখতে পেল। খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ডানিয়েল। পিছনে ঝপাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল গেট। মাথার ওপর জ্বলে উঠল নগ্ন একটা বালব্।

গাড়ির পিছন থেকে সামনে চলে এল একটা মেয়ে। যুবতী, কালো চুল। মিষ্টি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'নাহ্।' গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটার হাতে চাবি দিল

ডানিয়েল। 'গোলাপ কুঁড়ি এখন সম্পূর্ণ তোমার দায়িত্বে,' বলল সে। 'চলি, আমাকে আবার প্লেন ধরতে হবে।'

একই এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করল রানার কমার্শিয়াল প্লেন, এক ঘণ্টা পর। টার্মিনাল থেকে বেরুবার সময় পকেট থেকে পার্কিং কার্ড বের করল ও, অস্ট্রিয়ান পাসপোর্টের সাথে এটাও ওর হস্তগত হয়েছে। পার্কিং লট থেকে নীল ফোক্সওয়াগেনটা খুঁজে নিল ও, ফ্লোরম্যাটের তলায় পেল চাবি।

শহর ভিয়েনাকে এড়িয়ে গ্রিনজিং গ্রামের ভেতর দিয়ে ছুটল গাড়ি, তারপর পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে ভিয়েনা উড নামে পরিচিত বনভূমিতে ঢুকে পড়ল। পাসপোর্টের সাথে খুদে একটা ম্যাপও পেয়েছে রানা, কাজেই বড় রাস্তা ছেড়ে সরু পথে আসতে কোন অসুবিধে হলো না। চারদিকে গভীর জঙ্গল, পথ থেকে কটেজটা দেখা যায় না। সেটাকে ছাড়িয়ে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেল রানা, তারপর আরও সরু একটা পথে ঢুকে গাড়ি থামাল। বড় রাস্তা ছাড়ার পর একটা গাড়িও চোখে পড়েনি। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে কটেজের সামনে চলে এল ও।

ভেতর থেকে একটা দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় একটা মেয়ে। লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু মোটা নয়। চুল দেখে তাকে চিনতে পারল রানা। পরনে সেদিনের কালো পোশাক নেই, বদলে রয়েছে বাদামী স্ল্যাকস, আর সাদা সোয়েটার। সেই কালোকেশী।

তেরো

পথ দেখিয়ে রানাকে দোতলায় নিয়ে এল কালোকেশী। ঘরে ঢুকে

ডবল খাটের ওপর নরম বিছানা, বিছানার পাশে টেবিলে একটা ল্যাম্প দেখল রানা। বিছানার এক ধারে শুয়ে রয়েছে পা'জামা পরা ছোট্ট একটা ছেলে। তার হাতে সূচ বেঁধানো, টিউবের আগায় ফিট করা, টিউবটা একটা ঝুলন্ত বোতলে গিয়ে ঢুকেছে। তরল গ্লুকোজের সাথে ভিটামিন আর মিনারেলস মেশানো হয়েছে, অজ্ঞান হলেও, টিউলিপ কনওয়ের খোরাক দরকার।

রানার পিছন থেকে উঁকি দিল কালোকেশী। 'বলুন।'

উত্তর না দিয়ে টিউলিপকে খুঁটিয়ে দেখল রানা। বোঝার উপায় নেই এই মেয়েকেই মিশিগান থেকে চুরি করা হয়েছে। কোঁকড়ানো কালো চুল গায়েব হয়েছে। চুলগুলো এখন সমান, ছেলেদের মত করে কাটা, লম্বা হয়ে নেমে এসে বেশ খানিকটা ঢেকে ফেলেছে কপাল।

'কি হলো?'

'চমৎকার,' মন্তব্য করল রানা। ছেলের কাপড় পরালে অনায়াসে নিজের ছেলে বলে চালানো যাবে টিউলিপকে। পালস আর নিঃশ্বাস পরীক্ষা করার জন্যে ঝুঁকল রানা। তারপর সিধে হয়ে বলল, 'ওকে আরও একটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে।'

ইঙ্গিতে টেবিলটা দেখাল কালোকেশী। টেবিলে একটা হাইপোডারমিক কিট দেখল রানা।

'এভাবে কত দিন ওষুধ দিয়ে রাখা যাবে?' কালোকেশী জিজ্ঞেস করল।

'আরও দু'চার দিনে কোন অসুবিধে হবে না।' ঘুরে মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। ডাগর নীল চোখ, লাবণ্যমাখা তাজা মুখ, হলুদাভ মাখনের মত রঙ গায়ের। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে আজ আবার ভাবল রানা, ৩৬-২৪-৩৬?

'কি দেখছেন?' ঠোঁট নয়, যেন কমলার কোয়া—নড়ে উঠল। চেহারায় সারল্য, যেন কিছুই বোঝে না। রানা জানে, ওটা ভান।

'কি নামে ডাকব তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জিনা,' মধুর হেসে বলল কালোকেশী। 'জিনা উইলিয়ামস।'

'পাসপোর্টগুলো তোমার কাছে?'

'নিচের তলায়। দেখতে চান?'

'হ্যাঁ।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। হলরূমে ঢুকল। পাথুরে ফায়ারপ্লেসে আগুন নিভু নিভু। আলো জ্বালল জিনা। দেরাজ থেকে একটা ম্যানিলা এনভেলাপ বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল।

এনভেলাপের ভেতর তিনটে পাসপোর্ট পেল রানা। বাবা, মা, এবং ওদের চার বছরের পুত্র সন্তানের জন্যে। উইলিয়ামস পরিবার সেন্ট লুই, মিসৌরি-তে বাস করে। সুখী একটা পরিবার, ইউরোপে ছুটি কাটাতে এসেছে।

এনভেলাপের ভেতর থেকে আরও কাগজ বের করল রানা। সেগুলোর মধ্যে ফোক্সওয়াগেনের রেন্টাল ফর্ম-ও আছে। সব পরীক্ষা করে আবার এনভেলাপে ভরে রাখল ও। 'আমার জিনিস-পত্র?'

'যা যা দরকার সব আপনি বেডরূমে পাবেন,' বন্ধ একটা দরজার দিকে তাকাল জিনা।

'বেডরূম কি...'

'হ্যাঁ,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল জিনা, লালচে হয়ে ওঠা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকাল। 'একটাই।'

'গুড...।'

ঝট্ করে ফিরল জিনা। 'জ্বী?'

'রঁদেভো?' জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কাল বাদে পরশু, সেমেরিং পাস-এর কাছে।'

'গুড,' বলল রানা। 'তারমানে সীমান্ত না পেরোনো পর্যন্ত

আমাদের কিছু করার নেই?'

'না।'

'তোমার বুঝি তাই ধারণা?'

মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তারমানে?' গলা একটু রানার দিকে লম্বা করল মেয়েটা, চোখে শাসন।

'দুটো দিন অপেক্ষা করতে হবে, বাইরে মুখ দেখানো চলবে না, একটাই বেডরূম, আমার বয়স একশো দশ নয়, তুমিও কচি খুকী নও, কাছে-পিঠে আইনের লোক নেই–তারপরও তুমি ভাবো আমাদের কিছু করার থাকবে না?'

প্রথম কয়েক সেকেণ্ড বোকার মত তাকিয়ে থাকল জিনা, তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল। সমস্ত ভান উবে গেল চেহারা থেকে। নাচের ভঙ্গিতে জ্যা্ন, অস্থির হয়ে উঠল শরীর। হাসি থামতে ছোট্ট একটা মন্ব্য করল সে, 'দুই পাজিতে জমবে কিন্তু ভাল।'

সরকারি শবাগারের পরিচালক সসম্মানে বো করল, সরে গিয়ে পথ করে দিল আমেরিকান অফিসারকে। মনে মনে ভাবল, লোকটা শিন্ধীর ব্যক্তিগত বন্ধু কিনা কে জানে। আমেরিকান অফিসারের পরিচয় জানা নেই তার। পররাষ্ট্র দফতর থেকে এক লোক এসে তাকে শুধু বলে গেছে, মার্কিন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্মকর্তা হের ভ্যানডেরবার্গকে দেখতে আসবেন, তার সাথে যেন সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হয়।

চ্যাপেল্ থেকে বেরিয়ে গেল পরিচালক। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল হেনরি পিকেরিং। বড়সড় কামরা, র‍্যাকে মোমবাতি জ্বলছে। বোতাম টিপে ইলেকট্রিক আলো জ্বালল সে। দ্রুত পায়ে কাস্কেট-এর এক ধারে এসে দাঁড়াল। ওয়ালনাট আর

ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি কারুকাজ করা কাস্কেট, হফ ভ্যানডেরবার্গের শেষ বিশ্রামের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উপহার। বৃদ্ধ ওস্তাদের দিকে তাকাল সে। ম্লান মুখ, চোখ বন্ধ, সাদা সাটিনে মোড়া কুশনে আড়ষ্ট হয়ে আছে শরীর। শুধু বেহালাটা বাস্তব মনে হলো, সতর্কতার সাথে নিষ্প্রাণ একজোড়া হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিজেকে কফিন চোর বলে মনে হলো পিকেরিঙের, একজন মানুষের সবচেয়ে অসহায় অবস্থাটা লুকিয়ে দেখতে এসেছে। চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল সে। এখানে তার কাজ আছে।

কফিনের মেঝে পরীক্ষা করার জন্যে ঝুঁকল সে। পালিশ করা কাঠে আঙুল বুলাল। কোথাও কোথাও ভাঁজ করা আঙুলের গিঁট দিয়ে টোকা মারল। কই, কিছু না। এমন কিছু নেই যা দেখে ধারণা করা চলে টিউলিপ কনওয়ে এখানে এক সময় ছিল।

অথচ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার জানা আছে। এই কাস্কেটের সাথেই কোনভাবে ছিল। তবে নিরেট প্রমাণ যোগাড় করে নিয়ে যেতে হবে তাকে। এমন কিছু, জেফ রিকার্ড যা সাথে করে ওভাল অফিসে নিয়ে যেতে পারেন।

আপনমনে মাথা নেড়ে পিছিয়ে এল পিকেরিং, আরেক কোণ থেকে কাস্কেটের দিকে তাকাল। হঠাৎ করেই চোখে পড়ল খুদে আঁচড়ের দাগটা। কাস্কেটের তলায় ব্রোঞ্জের সরু বর্ডার রয়েছে, দাগটা সেই বর্ডারের ওপর। ভাল করে পরীক্ষা করল পিকেরিং। একটা নয়, কয়েকটা দাগ। প্রতিটি দাগ পরস্পরের কাছ থেকে সমান দূরত্বে। মাপল সে। আঠারো ইঞ্চি পর পর একটা করে আঁচড়ের দাগ।

চোখ দুটো উজ্জ্বল হলো তার, ক্ষীণ হাসি ফুটল চেহারায়। পকেট থেকে ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে শুরু করল সে।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন জেফ রিকার্ড, উত্তেজিত। ‘ওয়েল

ডান, হেনরি!’ ফোনে কথা বলছেন তিনি। ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফটোগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো।’

‘কাজ আমি মোটেও দেখাতে পারিনি, স্যার,’ ভিয়েনা থেকে বলল পিকেরিং। ‘অনেক খুঁজেও ড্রাইভারের কোন হদিস বের করা যায়নি। মানে, যে লোকটা কফিন সহ গাড়িটা এয়ারপোর্ট থেকে...’

রিকার্ড তার ডেপুটিকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘একটা ব্যাপারে তুমি শিওর তো? টিউলিপকে হার্স-এর ভেতর...’

‘নিশ্চয়ই তাই। হাতব্যাগ নিয়ে কয়েকজন অফিসার আর কফিন ছাড়া প্লেন থেকে কিছুই নামেনি। আরেক মাথায় কফিন রিসিভ করেছে সরকারী শবাগারের পরিচালক, তার সাথে আরও ত্রিশজন লোক ছিল। আমার এখানে পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত কফিনের কাছে একা থাকার সুযোগ হয়নি কারও। কোন সন্দেহ নেই হার্স-এর ভেতরই সরিয়ে ফেলা হয়েছে মেয়েটাকে, স্যার, কিন্তু ড্রাইভার লোকটা স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে।’

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জেফ রিকার্ড নির্দেশ দিলেন, ‘দেশটার সীমান্ত সীল করো, পিকেরিং। ওখানে আমাদের লোক আছে, প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে সবাইকে ডেকে নাও। ওদের ব্রিফিং করো, কি খুঁজতে হবে আভাস দাও।’

‘জ্বী, স্যার। এরইমধ্যে ইউরোপে আমাদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট যারা আছে তাদের অর্ধেকের বেশি লোককে ব্রিফ করেছি আমি। টেলিফোনে, অবশ্যই।’

‘অস্ট্রিয়ান?’

‘সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছে।’

‘বর্ডার?’

‘ওয়াশিংটন থেকে রওনা হবার আগেই সতর্ক করে দিয়েছি।’

‘গুড, আবার সতর্ক করো। কোথাও কোন ত্রুটি থাকুক আমি

চাই না। এয়ারপোর্ট আর রেইল রোড?'

'লোক আছে পাহারায়।'

'গুড।' রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন জেফ রিকার্ড। বললেন, 'মেয়েটাকে নিয়ে অস্ট্রিয়ায় হয়তো ঢুকতে পেরেছে ওরা, কিন্তু বাই গড, বেরুবার কোন রাস্তা পাবে না!'

অতিথি বরণ অনুষ্ঠানের শেষ পর্বটা বাগান থেকে চাক্ষুষ করলেন জেফ রিকার্ড।

ভাষণ পর্ব শেষ হলো, মেরিন ব্যাণ্ড বেজে উঠল, প্রথমটার পর বাজল দ্বিতীয় জাতীয় সঙ্গীত। রঙচঙে একটা গার্ড দু'দেশের পতাকা বয়ে নিয়ে গেল। প্লাটফর্ম থেকে নেমে এলেন প্রেসিডেন্ট, পথ দেখিয়ে বেলজিয়ান প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এলেন। অতিথিদের ছোট্ট একটা দলের কাছে। ডিপ্লোম্যাটিক এনট্রান্সের সামনে কালো একটা লিমুসিন অপেক্ষা করছে।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে করমর্দন করার সময় আন্তরিক হাসিতে উল্লাসিত হয়ে উঠল প্রেসিডেন্টের চেহারা। দু'জনের মধ্যে বৈঠক হবে, তবে বিশ্রামের জন্যে এখন ব্লেয়ার হাউসে গিয়ে উঠবেন প্রধানমন্ত্রী। পিছিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট, মুখের হাসি আগের মতই উজ্জ্বল। মিলিটারি ব্যাণ্ড বেজে উঠল, সঙ্কেত পেয়ে সচল হলো লিমুসিন। অনুষ্ঠান শেষ হলো। ঘুরে বাগানের দিকে পা বাড়ালেন প্রেসিডেন্ট।

বাগানে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন তিনি, মুখের হাসি নিভে গেল। যেন খসে পড়ল মুখোশ। 'জেফ, তুমি এখানে!'

প্রেসিডেন্টের সাথে হাঁটতে শুরু করে মৃদু হাসলেন জেফ রিকার্ড। রোজ গার্ডেন থেকে ওভাল অফিসের দিকে হাঁটছেন ওঁরা। 'আগেই আমি রওনা হয়ে গেছি, এই সময় তোমার মেসেজ পেলাম,' সি.আই.এ. চীফ বললেন। 'কিছু ভাল খবর বোধহয়

দিতে পারব।'

দ্রুত মুখ তুলে তাকালেন প্রেসিডেন্ট।

'আমরা জানি, টিউলিপ অস্ট্রিয়ায় আছে।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'কিভাবে জানলে?'

দ্রুত, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন রিচার্ড। প্রতিটি মুহূর্ত রিচার্ড কনওয়েের চেহারায় কি পরিবর্তন হয় লক্ষ করছেন। বন্ধুর চোখে তিনি আশার আলো দেখতে চান। একটু কৃতজ্ঞতার ছায়া। কিন্তু দেখলেন শুধু বিমূঢ় ভাব।

'লাভ এইটুকু যে,' ব্যাখ্যা শেষ করলেন রিকার্ড, 'এখন আমরা জানি কোথায় খুঁজতে হবে। আয়ত্তের মধ্যে যত ক্ষমতা আছে সব ওখানে প্রয়োগ করব আমরা।'

এক সেকেণ্ডের জন্যে চোখ বুজলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমার তা মনে হয় না,' বলে প্যাসেজ ধরে আবার হাঁটতে লাগলেন। 'আমি তোমাকে ডেকেছি, কারণ ওরা যোগাযোগ করেছে।'

এবার দাঁড়িয়ে পড়লেন জেফ রিকার্ড। 'ওরা...কিডন্যাপাররা?'

'হ্যাঁ।'

'হোয়াট? কোথায়? ভিয়েনা থেকে?'

'বার্লিন থেকে।'

'বার্লিন?'

কাঁচের দরজা ঠেলে সরাসরি নিজের অফিসে ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট। ভেতরে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কীথ বিউমণ্ট, সিক্রেট সার্ভিস চীফ।

'দেখান ওকে,' প্রেসিডেন্ট বললেন।

প্রেসিডেন্টের ডেস্ক থেকে কি যেন একটা তুলে রিকার্ডের দিকে বাড়িয়ে দিলেন কীথ বিউমণ্ট। একটা লকেট। সূক্ষ্ম কাজ করা সরু সোনার চেইনের সাথে আটকানো। লকেটের গায়ে টি

হরফটা এনগ্রেভ করা রয়েছে। ধীরে ধীরে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লেন রিকার্ড। দেখামাত্র চিনতে পেরেছেন লকেটটা। তৃতীয় জন্মদিনে মার্গারেট দিয়েছিল টিউলিপকে। মুখ তুলে কীথ বিউমণ্টের দিকে তাকালেন তিনি। 'টিউলিপ কি এটা পরে ছিল...?'

মাথা ঝাঁকালেন সিক্রেট সার্ভিস চীফ।

'এখানে ফেরত এল কিভাবে?'

'ডাকযোগে, প্রেসিডেন্টের নামে। মেইলরূম থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়। এয়ার স্পেশাল, দু'দিন আগে ওয়েস্ট বার্লিন থেকে পোস্ট করা হয়।'

'প্যাকেটে শুধু এটাই ছিল? শুধু লকেটটা?'

'না, এটাও ছিল।'

লকেটটা প্রেসিডেন্টের ডেস্কে রেখে দিয়ে কীথ বিউমণ্টের হাত থেকে এক টুকরো কাগজ নিলেন রিকার্ড। কাগজের লেখাটা পড়লেন তিনি, সাথে সাথে সমস্ত রক্ত নেমে গেল মুখ থেকে। ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি।

কাগজে তিনটে মাত্র শব্দ টাইপ করা। 'অ্যারো। গোল্ডেন বার।'

'লেখাটার কি মানে আমি জানি না,' বললেন বিউমণ্ট। 'বোঝা যাচ্ছে, আপনি জানেন।'

ধীরে ধীরে ওপর-নিচে মাথা দোলালেন রিকার্ড। তারপর ঝট্ করে প্রেসিডেন্টের দিকে মুখ তুললেন। 'তোমার সাথে একা কথা বলতে পারি? দুঃখিত, মি. বিউমণ্ট, এর সাথে জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেণ্ট, কীথ বিউমণ্ট নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে। ডেস্ক ঘুরে এগোলেন প্রেসিডেণ্ট, নিজের চেয়ারে বসলেন। উত্তেজনা আর হতাশায় পরিশ্রান্ত হয়ে

পড়েছেন। 'কোথায় ও?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'অস্ট্রিয়ায়, না জার্মানীতে?'

কথা না বলে রিকার্ড শুধু এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন।

'কিন্তু ওটার মানে কি তুমি জানো!' রিকার্ডের হাতে ধরা কাগজটার দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট।

'হ্যাঁ, জানি বৈকি।' সিধে হয়ে বসলেন রিকার্ড। 'গোল্ডেন বার পশ্চিম বার্লিনের একটা নাইটক্লাব,' শুরু করলেন তিনি। 'নামটা যুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈনিকদের দেয়া।'

'আমেরিকান সৈনিকরা ছাড়া আর কে ওটা চিনবে?'

'বার্লিনে একবার যে গেছে গোল্ডেন বার চিনবে সে।'

'আর অ্যারো?'

'সোভিয়েত সেক্টরে অ্যারো আমার এজেন্টদের একজন,' ধীরে ধীরে বললেন রিকার্ড। 'ধারণা করছি, মেসেজে বলা হয়েছে, গোল্ডেন বারে অ্যারো-কে পাঠাব আমরা, তারপর ওরা পরবর্তী চাল না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

প্রেসিডেন্ট সামনের দিকে ঝুঁকলেন। 'ফর গডস সেক, তাহলে এত রাখ রাখ ঢাক ঢাক কেন? পাঠিয়ে দাও তাকে!'

'ব্যাপারটা অত সহজ নয়, রিচার্ড। অ্যারো একটা কোড নেম। নিশ্ছিদ্র কাভার নিয়ে আছে সে। রাশিয়ানদের ইস্ট জার্মান কমাণ্ডে হাই র‍্যাঙ্কিং মিলিটারি অফিসার।'

'গড, জেফ! একজন রাশিয়ান?'

'কম-বেশি। তার জন্ম ওমাহায়, বহু বছর আগে সি.আই.এ. তাকে রাশিয়ায় পাঠিয়েছে। আমরা তার ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরি করে দিই। কোন কাজে লাগানো হয়নি, কাজেই কারও সন্দেহভাজনও হয়নি। বলতে পারো, সম্পূর্ণ রাশিয়ান হয়ে ওঠে সে। সোভিয়েত মিলিটারিতে ঢোকে, একটু একটু করে ওপরে ওঠে। প্রমাণ করে, তার রাশিয়া-প্রেমে কোন খাদ নেই। শুধু ট্রেনিং পেয়ে এত ওপরে

ওঠেনি, অনেকগুলো যুদ্ধেও প্রাণ বাজি রেখে লড়তে হয়েছে তাকে। যখন দেখলাম সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে, পদটাও ভারি গুরুত্বপূর্ণ, ঘরে ফসল তুলতে শুরু করলাম আমরা। হের, রিচার্ড, পূর্ব জার্মানীতে রুশ তৎপরতা সম্পর্কে খবর পাবার সে-ই আমাদের প্রধান উৎস। তার কাভার নষ্ট হবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

চেয়ারে হেলান দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমার তো মনে হচ্ছে তার কাভার এরই মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'নট নেসেসারিলি,' রিকার্ড বললেন। 'অ্যারো সম্পর্কে কেউ হয়তো জানতে পারে, এই কোড নেম ব্যবহার করছি আমরা। কিন্তু ওরা হয়তো জানে না অ্যারো কে।'

'গোল্ডেন বারে গেলে জানবে।'

'হ্যাঁ।'

ডেস্কের ওপর দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ওঁরা। ঘরের ভেতরটা নিস্তব্ধ। অবশেষে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ঝুঁকিটা আমাদের নিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন রিকার্ড।

অ্যারোর কপাল মন্দ! ওঁদের সামনে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই।

পশ্চিম বার্লিনের পুরানো রাইখস্ট্যাগ বিল্ডিং। টপ ফ্লোরের লাউঞ্জে ঢুকল পিকেরিং। প্রাইভেট লেখা দরজাটা বন্ধ করল সে। কামরার আরেক প্রান্তে জানালার সামনে চলে এল। স্প্রী নদী আর বার্লিন প্রাচীর একটা কোণ তৈরি করেছে, বিল্ডিংটা থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। বার্লিন প্রাচীরের ওপারে সোভিয়েত সেক্টরও দেখা যায় খানিক দূর। গার্ড টাওয়ারের মাথায় ইস্ট জার্মান সৈনিকরা সাবমেশিন গান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঝুলন্ত রশি টেনে জানালার পর্দা একটু নামাল পিকেরিং।

সঙ্কেত পেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করবে অ্যারো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল পিকেরিং, তার পিছনে দরজায় তালা লাগল।

গোল্ডেন বার একটা এলাহি ব্যাপার। প্রায় অন্ধকার গুহা বলা চলে। দুশো টেবিল, প্রতিটি টেবিলে একটা করে টেলিফোন আর ভয়েস পাইপ রয়েছে, বাইরে কারও সাথে কথা বলতে হলে টেবিল ছাড়তে হয় না, বা ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে গলা ফাটাবার দরকার নেই। ভিতরটা লোকে লোকারণ্য।

গোপন সাক্ষাতের জন্যে খুব বাজে একটা জায়গা, ভাবল অ্যারো। কেউ যে তার সাথে দেখা করবে, এ-ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত সে। এখানে তাকে আসতে বলার পিছনে আর কি কারণ থাকতে পারে?

মনে মনে সাংঘাতিক অস্বস্তিবোধ করছে অ্যারো। পূর্ব জার্মানীর একজন কর্নেল, পশ্চিম বার্লিনের একটা বারে বসে কি করছে?

তবু কাভার ভাঙার ঝুঁকি নেয়নি অ্যারো। কাভারটা অটুট রাখার একটা সুযোগ এখনও আছে তার।

ভাগ্যগুণে খালি একটা টেবিল পাওয়া গেছে। ভদকার অর্ডার দিয়েছে অ্যারো।

বিশাল একটা ড্যান্স ফ্লোরের সামনে অর্ধবৃত্ত আকৃতিতে ফেলা হয়েছে টেবিলগুলো। অর্কেস্ট্রা বাজছে ফ্লোরে, পিছনে সঙ্গীতের তালে তালে নাচছে ঝলমলে ঝর্না। বয়স্ক, যুবক, সব ধরনের লোক রয়েছে বারে, প্রায় অর্ধেকই মেয়ে। ট্যুরিস্টের সংখ্যাও কম নয়।

ড্যান্স ফ্লোরের উল্টো দিকের একটা টেবিলে গিনিপিগকে

দেখতে পেল অ্যারো। জানে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও অন্তত দশ-বারো জন এজেন্ট আছে সি.আই.এ-র। কে কোথায় দেখার কোন চেষ্টা করল না সে। মনে মনে ভাবল, গিনিপিগ আসলে আমার কোড নেম হওয়া উচিত ছিল।

অপেক্ষা।

কি জন্যে? কার জন্যে?

গভীর একটা শ্বাস টেনে চেয়ারে হেলান দিল অ্যারো। ডিনারটা আজ এড়িয়ে যেতে পারলে শরীরের ওপর রহম করা হত। মনে হচ্ছে পেটটা যেন সীসায় ভর্তি হয়ে আছে।

ড্রিঙ্ক নিয়ে এল ওয়েটার, সাথে সাথে বিল মিটিয়ে দিল অ্যারো। হঠাৎ বেরিয়ে পড়ার দরকার হলে তখন আর সময় নষ্ট হবে না। ভদকার গ্লাসে চুমুক দিয়ে কামরার চারদিকে চোখ বুলাল সে।

সম্ভাবনা নিয়ে দীর্ঘ এক ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে তার হেনরি পিকেরিঙের সাথে। পশ্চিম জার্মানী? না। ইউরোপে আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র পশ্চিম জার্মানী, অন্তত অর্থনৈতিক দিক থেকে তো বটেই। না, পশ্চিম জার্মানী টিউলিপ কনওয়েকে কিডন্যাপ করবে না।

মাথার পিছনে ভোঁতা একটা ব্যথা অনুভব করল অ্যারো। ঠিক ব্যথা নয়, একটু যেন চাপ। উত্তেজনা, ভাবল সে। গ্লাস তুলে আরেক ঢোক ভদকা খেলো।

কুখ্যাত কোন টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন? উদ্ভট কাজ করার প্রবণতা আছে ওদের, ঝুঁকি নেয়ার দুঃসাহস আছে। কিন্তু জার্মান টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো সূক্ষ্ম কোন কাজ বোঝে না। মার্কিন প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করার জন্যে কমাণ্ডো স্কোয়াড পাঠাত ওরা, সামনে যে ক'জনকে পেত খুন করে রেখে আসত।

টেরোরিস্টদের ধৈর্যও খুব কম। আরও অনেক আগেই দাবিটা

কি জানিয়ে দিত। সামান্যতম সাফল্য চেপে রাখার লোক ওরা নয়।

না, ওরা নয়।

বাকি থাকে পূর্ব জার্মানী। পূর্ব জার্মানী একা এ-ধরনের কাজে হাত দেবে, ভাবা যায় না। অবশ্য রাশিয়ার প্ররোচনা আর সাহায্য পেলে করতে পারে। কিন্তু করেনি। করলে জানতে পারত সে। নাকি পাঁচিলের ওপারের বন্ধুরা বিশেষ কোন কারণে ব্যাপারটা গোপন রেখেছে তার কাছে?

ধ্যেৎ, এসব কি ভাবছি! এমনিতেই কি আর মাথা ধরেছে! চাপটা বাড়ছে। এখন ব্যথাই বলা যায়। মাথার পিছন থেকে সামনের দিকে, কপালে ছড়িয়ে পড়েছে। চোখের পিছনটাও কেমন যেন দপ্ দপ্ করছে তার। ওয়েটারকে ডেকে একজোড়া অ্যাসপিরিন আনতে বলবে নাকি? ভয়েস পাইপে কথা বলল সে, কিন্তু ওর ওয়েটার সাড়া দিল না।

গোল্ডেন বারের কিচেন থেকে পিছনের দরজা দিয়ে সরু গলিতে বেরিয়ে এল এক লোক। গলির মুখে অপেক্ষা করছিল তার গাড়ি। ভেতরে ঢুকে ওয়েটার'স কস্টু্যমের ওপর একটা কোট চাপাল সে। স্টার্ট নিল গাড়ি, চলতে শুরু করল। রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল লোকটা।

মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে।

দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে অ্যারোর। কামরার উল্টো দিকে বসা গিনিপিগের দিকে তাকাল সে, কিন্তু দেখতে পেল না মেয়েটাকে। কাউকেই সে দেখতে পাচ্ছে না আর। যেদিকেই তাকাল, ছোপ ছোপ রঙ আর আলো ছাড়া কিছুই দেখল না। অর্কেস্ট্রার আওয়াজ হাতুড়ির বাড়ি মারছে মাথার ভেতর।

যোগাযোগ করতে হবে। গিনিপিগ অন্তত জানুক। ভাঙে ভাঙুক কাভার। জানানো দরকার মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে।

টেবিলের টেলিফোন হঠাৎ যেন নড়ে উঠে ধরা দিল দৃষ্টিতে, তারপরই কাঁপতে কাঁপতে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাত বাড়াল অ্যারো, হাতড়াতে গিয়ে গ্লাস ওল্টাল। আঙুল ঠেকল রিসিভারে, খপ্ করে ধরে ফেলল সেটা।

রিসিভার কানে তোলার চেষ্টা করল অ্যারো। গিনিপিগ কোথায়, তার টেবিলের ন'র কত?

মাথার প্রচণ্ড ব্যথায় কিছুই মনে করতে পারল না সে। চিন্তা করতে পারছে না, ইচ্ছেও করছে না। ঘুম! হ্যাঁ, ঘুমাতে চায় সে। শুধু যদি টেবিলে রাখতে পারত মাথাটা, তারপর ঘুমিয়ে যেত...।

কামরার ওদিক থেকে গিনিপিগ দেখল টেবিলের ওপর ঢলে পড়ল অ্যারো, অতিরিক্ত মদ খাওয়া মাতালের মত। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল সে, কিন্তু অ্যারো নড়ল না।

শান্তভাবে চেয়ার ছাড়ল গিনিপিগ, মুখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে এগিয়ে এল। দু'একটা টেবিলে থামল সে, এর-তার সাথে কুশলাদি বিনিময় করল, একটা মেয়েকে তার প্রেমিকের সাথে দেখে চোখ টিপল। গিনিপিগ সুন্দরী, বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয়নি, অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অ্যারোর টেবিলের কাছে পৌঁছে গেল সে। টেবিলটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর, যেন কৌতূহলবশত ঘুরে দাঁড়াল। 'এই যে ভাই, হ্যালো,' চাপা হাসির সাথে বলল সে, 'আপনার কি হয়েছে বলুন তো?'

অ্যারো নড়ল না।

'আপনি কি অসুস্থ?' অ্যারোর দিকে ঝুঁকে তাকাল গিনিপিগ। তার ঘাড়ে হাত রাখল একটা। তারপর, হঠাৎ সিধে হয়ে একজন

ওয়েটারকে ডাকল সে। 'এই, ভদ্রলোকের একটা অ্যাম্বুলেন্স দরকার!'

ওয়েটার অ্যারোর দিকে ঝুঁকল, এক পা পিছিয়ে এল গিনিপিগ। গলায় হাত দিল সে। এই সঙ্কেতটা সবাই ওরা ব্যবহার করে। অর্থটা বুঝতে কারও অসুবিধে হবে না।

অ্যারো মারা গেছে।

চোদ্দো

অস্ট্রিয়ান সীমান্তে পৌঁছুল ওরা।

নীল ফোক্সওয়াগেনকে অন্যান্য গাড়ির সাথে এক লাইনে দাঁড় করাল জিনা। সীমান্ত পেরিয়ে ইটালিতে যাবে গাড়িগুলো।

টিমোথি উইলিয়ামসের মার্কিন পাসপোর্ট গাড়ির কাগজ-পত্রের সাথে গ্লাভ কমপার্টমেন্টে রয়েছে। পাকাপোক্ত ভাবে তৈরি করা হয়েছে কাহিনী, নিশ্ছিদ্র। এখন সেটাকে কাজে লাগাবার সময়।

'ওঠো,' জরুরী সুরে তাগাদা দিল জিনা। 'বর্ডারে পৌঁছে গেছি আমরা।'

তার পাশে বসা লোকটা নড়েচড়ে সিধে হলো, চোখ রগড়ে সামনে তাকাল। প্রায় ঊনত্রিশ বছর বয়স তার, তাজা আমেরিকান অবয়ব, গরম-কোট পরে আছে। ছুটিতে সপরিবারে ইউরোপে বেড়াতে এসেছে।

চোখ মেলেই সতর্ক হয়ে গেল সে। ঘাড় ফিরিয়ে ব্যাক সীটে তাকাল, টনি উইলিয়ামস নড়াচড়া করছে না। বেচারা অসুস্থ। চিকেন পক্স। এত থাকতে এই সময়!

একজন কাস্টমস ইন্সপেক্টরকে এগিয়ে আসতে দেখে স্ত্রীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল টিমোথি।

'আপনাদের পাসপোর্ট।'

মিষ্টি করে হাসল জিনা, জানালা দিয়ে গলিয়ে পাসপোর্টগুলো ধরিয়ে দিল ইন্সপেক্টরের হাতে।

একটা পাসপোর্টে চোখ বুলাল ইন্সপেক্টর, তারপর ঝট্ করে জিনার দিকে তাকাল। নিচু হলো লোকটা, পাশে বসা টিমোথিকে দেখল। সবশেষে নজর ফেলল ব্যাক সীটে।

এবার বাকি দুটো পাসপোর্টে চোখ বুলাল ইন্সপেক্টর। 'ইটালি ভিজিট করার উদ্দেশ্য, ম্যাডাম জিনা?'

ইন্সপেক্টরের চোখে নগ্ন সন্দেহ দেখতে পেল জিনা। এবং হঠাৎ করে মাথার ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল তার। চেষ্টা করল, কিন্তু মনে পড়ল না কিছু—সব ভুলে গেছে। রানার সাথে প্রশ্ন আর উত্তরের রিহার্সেল দিয়েছে, কিন্তু কিছুই স্মরণ করতে পারল না। কোথায় যাচ্ছে জানে না। কেন যাচ্ছে তাও মনে নেই।

ভাগ্যই বলতে হবে, ঠিক এই সময় একটা পিক-আপ ট্রাক দ্বিতীয় লাইনে এসে দাঁড়াল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ শুনে বিরক্তির সাথে সেদিকে তাকাল ইন্সপেক্টর।

শুধু আওয়াজ নয়, সেই সাথে উৎকট দুর্গন্ধও।

ট্রাক ভর্তি এক পাল শুয়োর।

বড় করে শ্বাস টেনে সীটের গায়ে হেলান দিল জিনা।

কটু একটা মন্তব্য করে ঘাড় ফেরাল ইন্সপেক্টর, পাসপোর্টগুলো আবার একবার পরীক্ষা করল। 'হ্যাঁ, ম্যাডাম জিনা, ইটালি ভিজিটের উদ্দেশ্য কি আপনাদের?'

'বেড়ানো,' শান্তভাবে উত্তর দিতে পারল জিনা, মুখ টিপে একটু হাসলও। 'ছুটি কিনা, তাই বেরিয়ে পড়েছি। দক্ষিণে গাড়ি

ছোটাব–ফ্লোরেন্স দেখব, রোম দেখব... ।'

পিক-আপ ট্রাককে ঘিরে হৈ-চৈ শুরু হয়েছে। কাস্টমস অফিসাররা সবাই খুব বিরক্ত। দুর্গন্ধ কার সহ্য হয়! ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট কই? কোয়ারানটাইন পেপারস?

থোঃ করে এক দলা থুথু ফেলল ইন্সপেক্টর। 'আর গাড়িটা?' জানতে চাইল সে। 'আপনাদের?'

'ভিয়েনা থেকে ভাড়া করেছি।'

'কাগজগুলো দেখান।'

ট্রাকের ড্রাইভার ক্যাব থেকে নামল। লোকটা ইটালিয়ান কৃষক, প্রৌঢ়। নোংরা ক্যাপের ভেতর থেকে ততোধিক নোংরা কাঁচাপাকা চুল বেরিয়ে আছে। পরনের কাপড়ে চিমটি দিলে নখে ময়লা ঢুকবে। ট্রাকের পিছনে চলে গেল সে, খপ্ করে একটা শূকরছানাকে ধরল। তিনজন কাস্টমস অফিসার ছেঁকে ধরেছে তাকে। ছানার পায়ে একটা মেটাল ট্যাগ রয়েছে, অফিসারদের দেখাল সেটা।

কিন্তু ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ আর তর্ক বিতর্ক চলতেই থাকল। উইলিয়ামসদের পাসপোর্ট হাতে ইন্সপেক্টর এবার রেগে গেল। ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল সে, 'এত দেরি হচ্ছে কেন?'

একজন সাব-ইন্সপেক্টর দ্রুত কথা বলতে শুরু করল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর জানতে চাইল, 'কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'ট্যাগ লাগানো আছে?'

'জ্বী।'

'তাহলে বিদায় করো। জলদি!'

সাব-ইন্সপেক্টর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে হাত ঝাপটাল। কাঁধ ঝাঁকাল প্রৌঢ় কৃষক, গজর গজর করতে করতে উঠে পড়ল

ক্যাবে। জিনার দিকে ফিরল ইন্সপেক্টর। 'প্লীজ, আপনার গাড়ির কাগজ।'

গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে কার রেন্টাল ফর্ম বের করে বাড়িয়ে দিল জিনা। 'বোধহয় ঠিকঠাকই আছে সব,' বলে আবার মিষ্টি করে হাসল সে।

কিন্তু ইন্সপেক্টরের মেজাজ ভাল নেই। 'দেখা যাক।' খুঁটিয়ে কাগজগুলো দেখছে সে, তার পিছন থেকে চলে গেল পিক-আপ ট্রাক। হঠাৎ করে চারদিক বড় বেশি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আবার ঝুঁকল ইন্সপেক্টর, গাড়ির ভেতরটা ভাল করে দেখছে। এবার ঘুমন্ত বাচ্চাটার ওপর অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থাকল দৃষ্টি।

টি-শার্ট আর জিনস পরে আছে বাচ্চা। আমেরিকান টেনিস জুতো। মুখে লাল লাল দাগ।

'আপনার ছেলের মুখে ওগুলো কি, ম্যাডাম জিনা?'

'চিকেন পক্স।'

'চিকেন পক্স?' গলার আওয়াজেই বোঝা গেল, ইন্সপেক্টর বিশ্বাস করেনি। গাড়ির ওপাশের দরজা খুলে ফেলল সে। কাছ থেকে ভাল করে দেখল। তারপর আলতো করে হাত বুলাল টনি উইলিয়ামসের মুখে।

হঠাৎ সিধে হলো ইন্সপেক্টর। থমথম করছে চেহারা। 'দুঃখিত, ম্যাডাম। আপনাদের আমার সাথে আসতে হবে।'

চট্ করে একবার কাস্টমস বিল্ডিঙের দিকে তাকাল জিনা। তারপর ইন্সপেক্টরের কঠিন চোখে চোখ রাখল। 'কেন, কোথাও গোলমাল আছে?'

'এগুলো চিকেন পক্স নয়। আসুন আমার সাথে। আপনিও, স্যার। প্লীজ, বাচ্চাটাকেও সাথে নিন।'

রিসিভার আরও শক্ত করে চেপে ধরায় জেফ রিকার্ডের মুঠো সাদা

হয়ে গেল। 'কি বলছ, অ্যারো মারা গেছে!'

'ইয়েস স্যার, অ্যারো ইজ ডেড,' আবার বলল পিকেরিং। 'কেউ যেন প্ল্যানটাই করেছিল এভাবে, প্রকাশ্যে বের করে আনিয়ে খুন করবে অ্যারোকে।'

'কিন্তু কে? রাশিয়ানরা তাকে মারবে না। তার আগে তারা জানার চেষ্টা করবে কি কি তথ্য ওর কাছ থেকে পেয়েছি আমরা।'

'তাছাড়া, এভাবে প্রকাশ্যেও ওরা তাকে মারবে না।'

'তাহলে কে? অ্যারোর মৃত্যু আর কে চাইতে পারে?'

উত্তরটা সহজ। কেউ না।

রাগে, ক্ষোভে ডেস্কের ওপর দুম করে একটা ঘুসি মেরে বসলেন সি.আই.এ. চীফ। এমনকি বিস্ফোরিত কাভার নিয়ে দেশে ফিরে এলেও অমূল্য একটা সম্পদ হতে পারত অ্যারো। কিন্তু এখন সে লাশ, সি. আই. এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর আর এক ডজন ক্র্যাক এজেন্টের চোখের সামনে খুন করা হয়েছে তাকে অজ্ঞাত কারণে। অ্যারো মারা গেল, কিন্তু তারা কি প্রেসিডেন্টের মেয়ে সম্পর্কে কিছু জানতে পারল?

না।

বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন রিকার্ড। 'তুমি ঠিক জানো মারা যাবার আগে কেউ তার সাথে যোগাযোগ করেনি?'

'জানি, করেনি,' বলল পিকেরিং। 'পুরোটা সময় ওখানে আমি নিজে ছিলাম। ওয়েটার ছাড়া কেউ তার কাছাকাছি যায়নি।'

'ওয়েটার! ফর গডস সেক, হেনরি, বিষ যদি ভদকাতেই ছিল...'

'জানি,' কথার মাঝখানে শুকনো গলায় বলল পিকেরিং। 'ওয়েটার গায়েব। পালিয়েছে।'

হিস হিস করে উঠলেন রিকার্ড। 'ঠিক ভিয়েনায় যা ঘটেছে। অস্ট্রিয়া পুলিস বা আমাদের এজেন্টরা হার্স-এর ড্রাইভারকে

এখনও খুঁজে পায়নি।'

'একেও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। নামটা পর্যন্ত জানা যায়নি, স্যার।'

'কেন, গোল্ডেন বারের লোকেরা চেনে না?'

'কিভাবে! কিচেনে ঢুকে বলল, আজ অমুকের ডিউটি, কিন্তু সে অসুস্থ, তার বদলে আমি কাজ করব–সেই আমাকে পাঠিয়েছে।'

'অমুকটি কোথায়? সে-ও কি...?'

'জ্বী, স্যার। তারও কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'খবর হয়তো পাওয়া যাবে,' রিকার্ড গম্ভীর সুরে বললেন। 'কিন্তু মরা মানুষ কথা বলে না।'

'জ্বী, স্যার।'

'শোনো, হেনরি, দরকার হলে গোটা আর্মি ব্যবহার করো। ওয়েটার লোকটাকে চাই আমি। আর, জার্মানদের সাথে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখো। কিডন্যাপাররা যদি বার্লিনে থাকে, ওদের সাথে টিউলিপও থাকতে পারে। আমরা যতই সতর্ক থাকি, ওরা সীমান্ত পেরোতে পারেনি এ-কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আমি বলতে চাইছি, একই ঘটনা আবার যেন না ঘটে।'

'না, আসলে চিকেন পক্স নয়,' বলল জিনা। নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চার দিকে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় টনি উইলিয়ামস এখনও ঢুলছে।

একটা ভুরু উঁচু করল ইন্সপেক্টর। 'চিকেন পক্স তাহলে নকলও হয়?'

'বলতে পারেন ছেলেমানুষি কৌতুক,' ব্যাখ্যা করল জিনা। 'টনি নিজেই ওগুলো নিজের মুখে এঁকেছে। পাকা রঙ, ধুলে যায়

না। বিশ্বাস করুন, চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখিনি আমরা...'

'কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি কথা বলতে কি হয়েছিল?'

'সুযোগ দিলেন কোথায়! আমি তো বলতেই যাচ্ছিলাম...'

'ম্যাডাম জিনা,' ইন্সপেক্টর চটে উঠে বলল, 'এখানে আমাদের কৌতুক করার মত সময় নেই। আপনি জানেন, গোটা সীমান্তকে সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে? পুলিস আপনার ছেলের বয়েসী নিখোঁজ একটা বাচ্চাকে খুঁজছে। আমাদের বলা হয়েছে, সন্দেহ হলে সাথে বাচ্চা আছে এমন যে-কোন লোককে গ্রেফতার করতে হবে। নকল চিকেন পক্স অবশ্যই একটা সন্দেহজনক ব্যাপার!'

বিস্ময়ে, উদ্বেগে বিস্ফারিত হয়ে উঠল জিনার চোখ।

এতক্ষণে টিমোথি উইলিয়ামস ডেস্কের ওপর ঝুঁকে বলল, 'ঠিক কি বলতে চাইছেন, ইন্সপেক্টর? নিজেদের বাচ্চা কিডন্যাপ করেছি আমরা?'

'কি করেছেন না করেছেন তদন্তের পর জানা যাবে, স্যার,' ইন্সপেক্টর ঝাঁঝের সাথে বলল। 'আমি শুধু বলতে চাইছি, আপনাদের আইডেনটিটি ভেরিফাই না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যেতে পারবেন না।'

টিমোথি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল। তারপর সে বলল, 'দেশে এ-ধরনের সমস্যায় পড়লে ফোন করার অধিকার থাকত আমাদের।'

'সে অধিকার এখানেও আপনার আছে।'

'তাহলে সবচেয়ে কাছের আমেরিকান দূতাবাসের লাইন পাইয়ে দিন।'

অভ্যস্ত হয়ে গেছে রানা, শুয়োরগুলোর গায়ের গন্ধ তেমন আর নাকে লাগছে না। ইটালির ভেতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলেছে ও,

একটা চোখ রেখেছে রিয়ার ভিউ মিররে, অপেক্ষা করছে পিছনের রাস্তায় কখন দেখা যাবে জিনাকে।

ট্রাক ভর্তি শুয়োর নিয়ে এক ঘণ্টা হলো সীমান্ত পেরিয়েছে রানা, অথচ এখনও ফোক্সওয়াগেনের কোন দেখা নেই। গাড়ি মোটেও জোরে চালাচ্ছে না ও, এতক্ষণে ওকে ধরে ফেলা উচিত ছিল জিনার।

সন্দেহ নেই, সীমান্তে আটকানো হয়েছে ওদের।

আপন মনে হাসল রানা। ব্যাপারটা প্ল্যান মতই ঘটছে। জিনাকে নিয়ে ওর কোন দুশ্চিন্তা নেই, নিজেকে রক্ষা করতে পারবে সে। মার্কিন দূতাবাস ওদেরকে আইডেনটিফাই করবে। জিনার সাথের লোকটা আসলেও টিমোথি উইলিয়ামস্—সেণ্ট লুইস, মিশৌরির লোক। সি. আই.এ-তে চাকরি করে সে। বাচ্চাটা, টনি উইলিয়ামস, তারই সন্তান। অভিনয় যা শুধু খানিকটা জিনাকেই করতে হবে। রানার ধারণা, ভালই উতরে যাবে সে।

ট্রাকের গতি বাড়িয়ে দিল রানা। দেখতে ঝক্কড়মার্কা হলেও, ইঞ্জিনটা প্রায় নতুন, শক্তিশালী। এবার অল্প সময়ে অনেক দূর চলে যেতে পারবে ও।

ভেনিসের দক্ষিণে পৌঁছে হাইওয়ে ছেড়ে আঁকাবাঁকা মেটো পথে নামল ট্রাক, মাঠ আর খেতের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলল। সামনে পাহাড় দেখা গেল, কাছেই একটা ঢালে খামারটা। খামারের সামনে সদ্য চষা জমি, বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা খামার, কিন্তু নির্জন।

গাড়ি নিয়ে গোলায় ঢুকে মাথা থেকে ক্যাপ আর পরচুলা খুলে ফেলল রানা। মুখে লাগানো পাতলা রাবারের আবরণ বয়সটা ত্রিশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে, টেনে টেনে সেগুলো খুলল ও। জোঁক স্বভাবের অ্যাডহেসিভ সরাতে খানিকটা তুলো আর এক বোতল

অ্যালকোহলের সাহায্য নিতে হলো। আয়নায় নিজের দিকে তাকাল ও–আগের চেহারার অন্য এক সংস্করণ–ইটালিয়ান কৃষকই আছে ও, তবে যৌবন ফিরে পেয়েছে। পিঠ সিধে, স্যাম গ্রেসনের মত কালো চুল।

সীট থেকে নেমে লুকানো একটা বোতামে চাপ দিল রানা। কফিন যেভাবে উন্মুক্ত হয়, খুলে গেল সীট।

ভেতরে লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমাচ্ছে টিউলিপ। মাথার চুল কোঁকড়ানো নয়, ছোট ছোট কুণ্ডলী পাকানো। কুণ্ডলে ঢাকা পড়েনি কান আর কপাল। প্রেসিডেন্টের মেয়েকে এখন ছেলের মত দেখাচ্ছে। পরনে রানার মতই চাষার পোশাক, মাথায় কালো চুল।

আপন মনে মাথা ঝাঁকাল রানা। টিউলিপকে যারা দেখেছে তাদের বোকা বানানো যাবে না। তবে ওকে যদি ট্রাক থেকে বের করতে হত, অচেনা কেউ দেখে টের পেত না আসলে ও ছেলে নয়, মেয়ে।

টিউলিপের শ্বাস-প্রশ্বাস আর পালস চেক করল রানা, তারপর বন্ধ করে দিল সীটের ঢাকনি। পনেরো মিনিট পর ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে এল গোলা থেকে। ট্রাকে নতুন লাইসেন্স প্লেট। পকেটে নতুন কাগজ-পত্র। এবার আর শুয়োরগুলো সঙ্গী হলো না। ওরা এখন মুক্ত স্বাধীন।

বার্লিনে যা ঘটেছে, প্রেসিডেন্টকে তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন জেফ রিকার্ড। শুনতে শুনতে ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে এল প্রেসিডেন্টের চোখ। ডেস্কের পিছনে চেয়ারে বসে আছেন তিনি, কোন নড়াচড়া নেই। উঁচু হয়ে আছে কাঁধ জোড়া, চোয়াল শক্ত, ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে চেপে আছে। সি.আই.এ. চীফ, থামলেন। চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট। 'ড্যাম ইট!' এক সময়

বিস্ফোরিত হলেন তিনি। 'এ তুমি কি ধরনের অপারেশন চালাচ্ছ? আমার মেয়ে আজ ছ'দিন নিখোঁজ! এই অফিসের সমস্ত ক্ষমতা তোমার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, বিনিময়ে কি করতে পেরেছ? কিছুই না!' দ্রুত আধ পাক ঘুরলেন তিনি। 'অথচ তোমার এক পাল লোকের সামনে টপ-সিক্রেট, ডীপ-কাভার একজন এজেন্ট খুন হয়ে গেল!' হাত দুটো মুঠো করে ঝাঁকালেন তিনি, ক্রোধ সংবরণ করার চেষ্টা করলেন। 'মাই গড! গুড-ফর নাথিং-এর দল ঘিরে আছে আমাকে! সবাই সব কিছু লেজে-গোবরে করে ছাড়ছে। প্রথমে সিক্রেট সার্ভিস, তারপর তুমি। তুমি, জেফ, এত থাকতে তুমি! ভেবেছিলাম অন্তত তোমার ওপর আমি বিশ্বাস রাখতে পারি!'

চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে থাকলেন রিকার্ড। 'তুমি জানো আমার ওপর বিশ্বাস রাখা যায়।'

প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে থাকলেন, চোখে আগুন ঝরছে। তারপর, ধীরে ধীরে, নরম হলো তাঁর দৃষ্টি, ঝুলে পড়ল চিবুক, ক্লান্ত ভঙ্গিতে শরীরের দু'পাশে নেমে গেল হাত জোড়া। ডেস্কের পিছনে গিয়ে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। 'কি চায় ওরা বলে না কেন! অ্যারো? বেশ তো, তাকে ওরা বাগে পেয়ে সরিয়ে দিয়েছে।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন সি.আই.এ. চীফ। 'উঁহু, অ্যারো মোটিভ হতে পারে না।'

'নয় কেন? তুমি বলেছ অ্যারো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ভাইটাল...'

'বলেছি। কথাও সত্যি। অ্যারোর আসল পরিচয় জানার জন্যে অনেক বড় ঝুঁকি নিতে পারে রাশিয়ানরা—এমনকি টিউলিপকে কিডন্যাপ করার ঝুঁকিও। কিন্তু রাশিয়ানরা হলে গোল্ডেন বারে ওরা শুধু অ্যারোকে আইডেনটিফাই করত। অ্যারোকে তারা বার থেকে বেরোতে দিত, ঘরে ফিরতে দিত। তারপর গভীর রাতে ঘুম থেকে তুলে দযেরঝিনস্কি স্ট্রীটে,

কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেত—তাকে আর সেখান থেকে ইহজন্মে বেরুতে হত না। না, রিচার্ড, কাজটা রাশিয়ানদের নয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, অ্যারোর মৃত্যু আর কারা চাইতে পারে। আরও একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না। অ্যারোকে সরাতে চাইলে আরও হাজারটা উপায় ছিল, তবু এ-ধরনের জমকালো আয়োজনের দরকার পড়ল কেন? এ-সবের কোন অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

প্রেসিডেন্টের ডেস্কে মৃদু শব্দে বেল বেজে উঠল। প্রেসিডেন্ট সামনের দিকে ঝুঁকলেন। 'ইয়েস?'

'সিক্রেট সার্ভিস ডিরেক্টর আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

তিনি মুখ তুললেন, জেফ রিকার্ডের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

'পাঠাও।'

নিজের পিছনে দরজা বন্ধ করলেন কীথ বিউমন্ট, এক মুহূর্ত স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর কাঁধ দুটো ক্লান্তিতে ঝুলে পড়েছে। ওখানে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি যেন দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছেন। তাঁর চোখে নগ্ন হয়ে ফুটে আছে পরাজয়ের গ্লানি। হাতে করে একটা বাক্স নিয়ে এসেছেন তিনি। 'আজকের ডাকে এসেছে এটা,' ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বললেন। 'জোহ্যান্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে।' আস্তে করে ডেস্কের ওপর রাখলেন বাক্সটা।

রিচার্ড কনওয়ে বাক্সের ঢাকনি খুললেন। এক জোড়া পা'জামা। ছোট্ট।

'মিসেস কেনটারকি ওটা চিনতে পেরেছে,' বললেন বিউমন্ট। 'কিডন্যাপড হওয়ার সময় ওটাই পরে ছিল টিউলিপ।'

মাথা নিচু করে আছেন প্রেসিডেন্ট। বাক্সের ভেতর থেকে পা'জামা জোড়া বের করলেন, হাতে নিয়ে ভাল করে দেখছেন।

তীক্ষ্ণ ব্যথার ছাপ ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়।

ঝুঁকে, বাক্সের ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে আনলেন জেফ রিকার্ড। এক কোণ থেকে উঁকি দিচ্ছিল ওটা। কাগজের লেখাটা পড়ে আবার হেলান দিলেন চেয়ারে।

কাগজে এবার চারটে শব্দ টাইপ করা। 'এগম্যান। ওল্ড সাউথ চার্চ।'

সেই একই ঘটনা আবার নতুন করে!

কাগজটার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সি.আই.এ. চীফ।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)